DISCUSSION ON JATRA
FROM THE COLLECTIONS OF
NATYA SHODH SANSTHAN AUDIO LIBRARY

নাট্য শোধ সংস্থান আয়োজিত আলোচনাচক্রের সম্পূর্ণ প্রতিবেদন

তৎকালীন যাত্রার একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা
১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন
প্রতিভা অগ্রবাল, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, জ্যোৎস্না দত্ত, অসিত বসু এবং তাপস সেন।
এটি সংস্থান আয়োজিত প্রথম আলোচনাচক্র।

NATYA SHODH SANSTHAN
EE 8, Sector 2, Salt Lake, Kolkata 700091
MAIL: natyashodhsansthan@gmail.com
Phone (033)23217667

প্রতিভা অগ্রবাল

নাট্যশোধের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে হার্দিক স্বাগত জানাই। আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে যাত্রা জগতের অনেক সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। বাংলাদেশে যাত্রার ঐতিহ্য এবং গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং থিয়েটারের সঙ্গে যাত্রার বিগত দিনগুলিতে বেশ ভালোই আদান-প্রদান ছিল। আজকের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যাত্রা থেকে কত মানুষ থিয়েটারে গেছেন এবং ক'জনই বা থিয়েটার থেকে যাত্রায় এসেছেন। এ কথা নিশ্চিত যে বিগত দিনে বহু মানুষ থিয়েটার থেকে যাত্রায় এসেছেন। যাত্রার বর্ত্তমান অবস্থা কেমন, যাত্রার কাজ কেমন চলছে, এবং যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে যাত্রার সঙ্গে যুক্ত আছেন তাঁরা অবশ্যই বলতে পারবেন যাত্রায় কি কি নতুন বিষয় বিগত দিনে সংযুক্ত হয়েছে এবং সেগুলির গুরুত্ব কি এবং বাংলার নাট্যকর্মকে তা কেমনভাবে প্রভাবিত করছে। আজ আমাদের মধ্যে শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারী [i] মশায় বসে আছেন। যখন ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, আমি জানতাম না, প্রশ্ন করে বসেছিলাম, আপনি কি করেন? তখন ওনার নামটাই শুধু জানা ছিল। তা উনি জবাব দিয়েছিলেন আমার ইন্ডাস্ট্রি আছে। যাত্রার ইন্ডাস্ট্রি। শুনে আমার খুব মজা লেগেছিল এবং হাসিও পেয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন যাত্রা ইন্ডাস্ট্রির turnover –এর fantastic figure উনি আমার সামনে রাখলেন, আমার অবস্থা শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। উনি যা দেখালেন তা আমার কল্পনাতেও ছিল না, সেগুলো প্রবোধবাবু নিজেই বলবেন আর জ্যোৎস্না দত্ত, যিনি সুদীর্ঘকাল ধরে যাত্রায় কাজ করছেন, যাঁকে আজ যাত্রা জগতে এক সম্মানের আসন দেওয়া হয়, এবং শ্রী তাপস সেন [ii], যাঁকে সবাই আপনারা ভালো করেই জানেন। হয়তো এই প্রথমবার তাপসদাও যাত্রার কবলে পড়েছেন, তাই উনি কি কাজ করছেন এবং তা করতে ওনার কেমন লাগছে আমরা তা জানব। আর রয়েছেন শ্রীঅসিত বোস [iii], থিয়েটার এবং যাত্রা দুটির সঙ্গেই যাঁর সম্পর্ক, তিনি এসেছেন থিয়েটার থেকে যাত্রায়, এবং দীর্ঘ সময় ধরে যাত্রার সঙ্গে যুক্ত আছেন। আমি আজকের আলোচনা সঞ্চালনার দায়িত্ব তাপসদাকে দিচ্ছি।

Discussion on Jatra at NSS on 12-9-82. Participants L to R: Jyotsna Dutta, Prabodhbandhu Adhikari, Tapas Sen, Asit Basu, Pratibha Agrawal

তাপস সেন

প্রবোধবন্ধুবাবুর পাশে যাত্রা সম্পর্কে সঞ্চালিত-টঞ্চালিত করার ব্যাপারে আমি একেবারেই অনধিকারী। উনি যাত্রার সত্যিকারের অধিকারী লোক। আর আমার জ্ঞানও প্রতিভাজির [iv] মতনই সীমিত। আর যাত্রার যাঁরা আছেন, বা অজিতেশবাবু [v] নিয়ে, আমি তো একেবারে কনিষ্ঠতম। একেবারে নতুন, তাজা, এখনো কোনো অভিজ্ঞতাও হয়নি, কিছু কিছু দেখেছি। সুতরাং আমাকে এই ডিউটি দেওয়ার দুটো বিপদ আছে। একটা হচ্ছে যে যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ বসে থাকতে হবে সতরঞ্চিওয়ালার মতন। যে যার বলে চলে যেতে পারেন, আমাকে থেকেই যেতে হবে। সেটার জন্যে, আমার একটা শো চলছে, সেইখান থেকে আমি চলে এসেছি খানিকক্ষণের জন্যে। তা এই দায়িত্ব, যার ঠিকমতো পালন করার ক্ষমতা আছে, এবং পারেন, তাঁর নাম হল – এই নাট্যশোধ সংস্থানের অন্যতম একজন উৎসাহী পরিচালক – শমীক বন্দোপাধ্যায় [vi] । তিনি যাত্রা সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন এবং যাত্রা সম্পর্কে নানানরকম খোঁজখবর আমাকে দিয়েছেন এবং আমাকে যাত্রায় কাজ করবার জন্যেও উৎসাহিত বা প্ররোচিত করেছেন। সুতরাং শমীক বন্দোপাধ্যায় এই পরিচালনা টালনাগুলো ভালই করে থাকেন এবং করতে পারেন। আমি কিছুই করতে পারব না সে ব্যাপারে। আমি, প্রবোধবন্ধুবাবু যাত্রার যে পুনরুজ্জীবন এবং নতুন উৎসাহ কলকাতায় তথা সারা পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষে, তার জন্যে প্রবোধবন্ধুবাবুকে আমরা ঠাট্টা করেও বলি, সত্যিকারেরও মনে করি – যে 'যাত্রাবন্ধু অধিকারী' আমরা বলি এবং বলে থাকি। প্রবোধবাবুর ভূমিকা যাত্রা জগতের সবাই জানেন এবং উনি আজ থেকে বহুবছর আগে প্রথম একটা শোরগোল পড়ে গেল, শোভাবাজার রাজবাটীতে বোধহয় না? সেইখানে একটা উদ্যোগ করেন। আমি সেখানে, যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল এবং প্রবোধবাবু তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। তারপর থেকে, ঐ যে ইনডাস্ট্রি প্রতিভাজি বললেন, সেই ইনডাস্ট্রির মধ্যে উনি অন্যতম একজন নার্ভ-সেন্টার বা ব্রেন- সেন্টার এবং একেবারে কন্ট্রোলিং - কম্পিউটার নিয়ে বসে আছেন। সবরকমের, সেটা ভালো খারাপ সবদিকই আছে। তো প্রবোধবাবু, খোঁজখবর, যাত্রার ইতিহাস, যাত্রার পটভূমিকা এবং আজকের দিনের যাত্রা সম্পর্কে বলার সত্যিকারের অধিকার রাখেন। আমি প্রথমেই প্রবোধবাবুকে অনুরোধ করব। আর আজ একটাই কথা আমার মনে হচ্ছে, আমার যা সামান্য দু-চার কথা বলার, তার মধ্যে এই কথাটা পরিচালক হিসেবেই আগে বলে ফেলি, যে কোন সময় পালিয়ে যাব বলে, সেটা হচ্ছে যে, যাত্রাজগতে আরও বোধহয় প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ দু-একজনকে যদি পাওয়া যেত - ভালো হত। নিশ্চয়ই ওঁরা চেষ্টা করেছেন, শমীকবাবু তো খোঁজ খবর রাখেন এবং যারা আছেন এর মধ্যে এই সব কচিকাঁচা, আমার থেকে বয়সে কনিষ্ঠ অসিত এবং অজিতেশ বা উৎপল [vii] , শ্যামল ঘোষ,[viii] শ্যামল সেন,[ix] তাঁরা সেইদিক থেকে যাত্রায় বয়োজ্যেষ্ঠ। আর জ্যোৎস্নাদেবী[x] কে তো সেই কবে 'সোনাই দীঘি'[xi] র আমল থেকে দেখছি। প্রবোধবাবু ছাড়া, যিনি সত্যিকারের যাত্রাজগতের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে, যাঁর কাজের সাক্ষর আমরা সবাই পেয়েছি, তাঁর কথাতো আছেই। আমার মনে হচ্ছিল যে সেইরকম যদি আরও কয়েকজনকে রাখা যেত বা আনা যেত তাহলে ভালো হোত নিশ্চয়ই। শমীকবাবু প্রতিভাদি চেষ্টা করেছেন – এই কথা বলে আমি প্রথমেই প্রবোধবাবুকে তাঁর যাত্রা সম্পর্কে আমাদের সবাইকেই কিছু বলুন এবং তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি প্রথমে এবং সব কথা বলার। তারপর যা দু-চার কথা আমার বলার সেটা বলব। অজিতেশবাবু আশা করছি তার মধ্যেই এসে যাবেন এবং শমীকবাবুও এসে যাবেন। তিনিও অন্য পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে পুরো ব্যাপারটার একটা কম্প্রিহেন্সিভ পিকচার নিশ্চয়ই দিতে পারবেন। প্রবোধবাবু -

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

প্রথম কথা হল যে, প্রতিভাদির সঙ্গে যখন পরিচয় হয় আমার, তখন আমি বলেছিলাম যে যাত্রা ইন্ডাস্ট্রি।এখন যাত্রা ইন্ডাস্ট্রি কিনা – এই একটা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। আমরা মোটামুটিভাবে জানি যে, আর্ট অনেক সময়

ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয় এবং তার রেজাল্ট যে সবসময় ভালো হয় একথা বলা যায় না। কাজেই যাত্রার ক্ষেত্রে ভালোমন্দটা এখন বিচার করার ব্যাপার আছে। তবে আমি যে কথাটা সেদিন বলেছিলাম, তার একটি

ছোটোখাটো ছবি আমি এখানে উপস্থিত করছি। সেটা হচ্ছে যে, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে বোনাফাইড প্রফেশনাল যাত্রাপার্টি কতগুলো আছে – সেটা জানা দরকার। আমাদের কলকাতা শহরে বাহাত্তরটা দল আছে, পেশাদারী যাত্রার দল। মেদিনীপুরে আছে বিয়াল্লিশটা যাত্রার দল, বাঁকুড়াতে সতেরোটা, বীরভূমে ঊনিশটা, নদীয়াতে ঊনত্রিশটা, পুরুলিয়াতে বাইশটা, বর্ধমানে ছাব্বিশটা, জলপাইগুড়িতে ন'টা, কোচবিহারে ছ'টা, চব্বিশ পরগণায় তেতাল্লিশটা, মুর্শিদাবাদে পনেরোটা, হাওড়াতে দশটা, হুগলীতে ছ'টা, ওয়েস্ট দিনাজপুরে চারটা, মালদাতে চারটা আর শিলিগুড়িতে আছে একটা দল, তার মানে দার্জিলিং ডিষ্ট্রিক্টে। টোটাল হচ্ছে, কলকাতায় বাহাত্তর এবং মফস্বল - সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট মিলিয়ে দু'শ পঞ্চান্ন। এটা প্রফেশনাল যাত্রার দল। যারা যাত্রার ব্যবসা করে আমার চব্বিশ হাজার লোকের মুখে অন্ন তুলে দেয়। চব্বিশ হাজার পরিবারের মুখে। টোটাল হচ্ছে – আমার ম্যান পাওয়ারের কথা বলছি, এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত কতগুলো লোক, সেটা কিভাবে আছে। আমরা মোটামুটিভাবে জানি, আগেকার দিনে আমাদের ষাট থেকে সত্তরজন লোক লাগতো, বা কোন কোন বড় দলে একশজন লোকও লাগতো, এটা আমার চাইতে তখনকার চিত্র জ্যোৎস্না ভালো বলতে পারবে। কেননা জ্যোৎস্না তো একদম সাত বছর বয়েসে, খুব ছোটবেলায় প্রথম যাত্রায় –she is the first lady of our institute–কাজেই ও বাচ্চাকাল থেকে যে অভিজ্ঞতাটা সঞ্চয়করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছেছে, ও আমার চাইতে ব্যাপারটা আরো ভালো বলতে পারবে।তবে আমি মোটামুটি একটা ছবি দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে তিনশ সাতাশটা গ্রুপ আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে, তার মধ্যে প্রত্যেকটা দলে আমি যদি ষাটজন করে লোক ধরি, তাহলে আমার লোকসংখ্যা হচ্ছে ১৯৬২০, এই প্রফেশনাল গ্রুপস-এর সঙ্গে। প্যান্ডেল, ওয়ার্কার্স, ইত্যাদি – এটা হচ্ছে ৬৪১। পাবলিসিটি, মাইক, রিক্সা, ভেহিকেলস হচ্ছে ৩২৭। বাস, ট্রাক হচ্ছে টোটাল ৯৮১। ড্রেস মেকিং ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে ৬৪৩। টোটাল– ২৩০২৫জন লোক এর সংগে করে খায়। তার মানে ২৪০০০।এদিক ওদিক মিলিয়ে আমি মোটামুটি ভাবে, অনেক বাদ-সাদ দিয়ে যেটা ধরেছি সেটা হচ্ছে টোটাল ২৪০০০ লোক আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রির সংগে যুক্ত এবং তার দ্বারা ২৪০০০ পরিবার প্র্যাক্টিক্যালি প্রতিপালিত হয়। আচ্ছা, এই যে বিরাট যাত্রার দল, এই যাত্রার দলকে চালায় কে? এই একটা প্রশ্ন থাকে তো। আমাদের যাত্রার দলকে চালায় নায়েক পার্টি। নায়েক মানে যারা এই যাত্রার দলকে এসে বায়না করে বিভিন্ন কেন্দ্রে নিয়ে যায় এবং এই কেন্দ্রে এসে যাত্রার দল কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে যায় – এত টাকার চুক্তি পার নাইট অথবা ডবল ডে, অথবা তিনদিন। এইভাবে আগেকার দিনে যেটা হোত, যে একটা দল তিনদিন থেকে পাঁচদিন - আমাদের বাড়িতে ছোটবেলায় খুব যাত্রা হোত, আমরা ছোটবেলা থেকে একদম জন্ম থেকে যাত্রা

দেখেছি। এটা হচ্ছে মৈমনসিং জেলার টাঙাইল সাব-ডিভিসন। মাইথান গ্রাম। আমাদের বাড়িতে যাত্রা হত। প্রায় জন্ম থেকেই, প্রায় প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হয়ে যাত্রা দেখেছি। তারপর থেকে প্রায় আঠারো বছর আমরা যাত্রা দেখেছি আমাদের গ্রামে, আমাদের বাড়িতেই। সুতরাং তখনকার নট্ট কোম্পানী, আর্য অপেরা, নিউ গণেশ অপেরা [xii], তখনকার দিনের ভান্ডারী অপেরা যে সকল বড় বড় দল ছিল – সকলেই আমাদের বাড়িতে গেছে এবং একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, এ প্রসঙ্গে আমি একটা লেখাও লিখেছিলাম সেটা হচ্ছে 'নিঃশব্দ নির্বাসন'– যে কিছুই শেষ পর্যন্ত থাকে না। আমি এত চেষ্টা করছি, যাত্রা ইন্ডাস্ট্রি হয়ত থাকবে না, আমিও থাকব না এটা ঠিকই। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি যে যাত্রার দল যখন আসতো, একটা দল সাতদিন অভিনয় করতো। নট্ট হোক বা অন্য যেকোন দল হোক, আমরা সারারাত জেগে আছি, নৌকো আসছে। হঠাৎ রাত্রি তিনটের সময় খবর এল নৌকো আসছে, নৌকো আসছে! গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়ে দৌড়। সেই নদী। কোথা থেকে নৌকো আসছে? সেই নৌকোটা আসছে! যাত্রার নৌকো, ভিড়ল এসে। ভিড়ে সেখানে এসে সাতদিন তারা থাকলো। সাতদিন থেকে ন'দিন। থেকে, খাওয়া দাওয়া করে মেলামেশা করে এমন একটা সম্পর্ক হয়ে গেল সমস্ত মানুষের সঙ্গে যে, যখন এই দলটা চলে যাচ্ছে, অভিনয়ের শেষে, সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়ছে, সকলের চোখে জল এবং যাত্রাওয়ালা যারা যাচ্ছে তাদের চোখেও জল। এই যে আন্তরিক সম্পর্কটা, সেটা আজকে ইন্ডাস্ট্রি হবার ফলে এই রিলেশনসটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সমস্ত ব্যাপারটাই ব্যবসার মাধ্যম হয়েছে। আগেকার দিনে আমাদের বাবা দাদা-রা বিত্তশালী লোক ছিলেন, তারা পয়সা দিয়ে যাত্রার দল আনতেন এবং আমাদের প্রজা-টজারা শুনতো। কিন্তু সেদিন তো আর নেই, এখন প্রজারাই হচ্ছে রাজা। সুতরাং তারাই পয়সা দিয়ে দেখে। যাই হোক, এই যে বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে বিভিন্ন নায়েক আসে, এই নায়েকরা সকলেই সৎ নয়। এমনও হয়, যে বহু টাকা – ইন্ডাস্ট্রির প্রচুর টাকা – এদিক-ওদিক থেকে নষ্ট হয়। কন্ট্রাক্ট করে করে, তারপরেতে নিয়ে গিয়ে পুরো টাকা দেয় না, এজন্য আমাকে একটা প্রোপ্রাইটার্স অ্যাসোশিয়েশন করতে হয়েছে। যে আস্তে আস্তে ওরা যত ফাঁকফোকর বার করছে, আমরা তত কঠিন হচ্ছি, আমরা যত কঠিন হচ্ছি ওরা তত ফাঁকফোকর বার করছে। এইভাবে একটা ব্যবসা হলেই তার একটা ফাঁকের দিক থাকে। যেমন আইন হলে, আইনের থেকে বাঁচবার একটা রাস্তা হয়। তেমনি এক্ষেত্রেও তাই। এটা একটা বিজনেস মিডিয়া হবার ফলে, তাতে এ ওকে ঠকাবার একটা চেষ্টা সবসময়েই চলে যাচ্ছে। যাই হোক, আমি মোটামুটি একটা পরিসংখ্যান দিচ্ছি যে, বোনাফায়েড নায়েক, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে কোথায় কতজন আছে। মেদিনীপুরে আছে ২১০, বর্ধমানে আছে ২২৯ কোলিয়ারী ফিল্ড শুদ্ধু, চব্বিশ পরগণায় নর্থ এবং সাউথ মিলিয়ে আছে ৩০১, বাঁকুড়াতে আছে ৯৫, বীরভূমে ৯৬, নদীয়াতে ১০৩, হাওড়াতে ১২১, পুরুলিয়াতে ৩২, হুগলীতে ৯৩, মুর্শিদাবাদে ৮৭, মালদাতে ৩২, জলপাইগুড়িতে ৭০, কোচবিহারে ৪৯, দার্জিলিং-এ ১২, ওয়েস্ট দিনাজপুরে ৩৬–টোটাল ১৫৬৬জন বোনাফায়েড নায়েক। মানে যারা প্রতারণা-টতারণা কম করেন। আসামটা আলাদা, এটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ছবি। আচ্ছা, আসামের - আপার এবং লোয়ার আসাম, কাছাড়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মণিপুর – এই সমস্ত মিলিয়ে আছে ১২৮০জন নায়েক। মানে যারা প্রথমশ্রেণীর নায়েক বলে মনে করি আমরা, যাদেরকে আমরা একটাকা বায়না নিয়ে গেলেও পুরো টাকাটা পাই। আদার প্রভিন্সেসে কোথায় কোথায় এই যাত্রার আসর আমরা করেছি, এবং আমার ব্যক্তিগত প্রয়াসে বহু জায়গায় আমি যাত্রার আসর করিয়েছি বাংলাদেশের বাইরে –টু সেভ আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি। কেননা, জায়গাটা ক্রমশ কমে যাচ্ছে, দলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে –সুতরাং একে যদি ছড়িয়ে না দেওয়া যায়, তাহলে এই ইন্ডাস্ট্রি-টা মারা যাবে। সুতরাং আমাকে বাংলার বাইরে, যেমন উড়িষ্যাতে আমি পরপর আট-দশবার গিয়ে, এ বছর নতুন নতুন কতকগুলো আসর করেছি। আমি আবার এই দন্ডকারণ্যের দিকে যাচ্ছি কতকগুলো নতুন আসর করব বলে। আদার প্রভিন্সের মধ্যে বিহারে নায়েকের সংখ্যা হচ্ছে ১২৩, উড়িষ্যাতে ৪৮, মধ্যপ্রদেশে ৬৩, ইউপিতে ৩১, রাজস্থানে ৫,

মহারাষ্ট্রে ২৭। এই ২৯৭। আউটসাইড মানে আদার দ্যান আসাম ।ওই সাইডটা বাদে এই দিকের আরকি। একটা কথা বলছি, ওয়েস্ট বেঙ্গলে টোটাল দল হচ্ছে – টোটাল নায়েক হচ্ছে ১৫৬৬। এক হাজার পাঁচশো ছেষট্টি। প্রত্যেকটা নায়েকের এখানে গড়ে একটা অভিনয় ধরা যাক, মিনিমাম পাঁচটা। মানে সাতদিনও হয়, দশদিনও হয়, বারো দিনও হয়, তাহলে মিনিমাম শো যদি পাঁচ দিয়ে ১৫৬৬কে গুণ করি, তাহলে ৭৮৩০ হচ্ছে। ৭৮৩০ যদি হয়, তাহলে চোদ্দ হাজার গড় দর্শক ধরে, মানে নট্ট কোম্পানী ৮০থেকে শুরু করে আমার নতুন যাত্রার দল ৫০০০ পর্য্যন্ত দিয়ে আমি টোটাল একটা বার করেছি গড় – হচ্ছে ১৪০০০। তাহলে আমার দেখা যাচ্ছে ১৪০০০ ইন্টু ৭৮৩০-টা শো, তার মানে ১০ কোটি ৯৬ লক্ষ ২০ হাজার।এইটা হচ্ছে দর্শক, ওয়েস্ট বেঙ্গলে । আচ্ছা, এইবার টিকিটের রেটে আসছি। আমার টিকিট আগে আট আনা ছিল, একটাকা ছিল, দু'টাকা ছিল, এখন মিনিমাম টিকিট তিন টাকা, তিন টাকা থেকে দশটাকা। আমি মিনিমাম টিকিট ধরেছি- পাঁচটাকা গড়। তাতে দশ কোটি ৯৬ লক্ষ ২০ হাজার ইন্টু ৫, তাহলে দাঁড়াচ্ছে, একান্ন কোটি একষট্টি লক্ষ টাকা। এই টাকাটা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের যাত্রার দর্শক আমাদের দিয়ে থাকেন।   এইবার আসামে যাচ্ছি। আসামে টোটাল নায়েকের সংখ্যা হচ্ছে ১২৮০। যদি পাঁচটা করে শো হয়, আসামে একটু বেশিদিন শো হয়, মানে একটা দল গেলে, পাঁচদিন সাতদিন করে ওরা রাখে। তারপর ডবল শো আছে, একটা দল গেল আর একটা দল আছে। তবু মিনিমাম ধরেছি, খুব কম করে। পাঁচটা শো প্রতি আসরে। তাহলে ১২৮০ ইন্টু ৫, ছ'হাজার চার'শ । খুব কম করে দর্শক ধরছি ৫০০০। ৬৪০০ ইন্টু ৫০০০, তার মানে হচ্ছে ৩ কোটি ২০ লক্ষ। আর মিনিমাম টিকিট হচ্ছে ৪টাকা করে। এখানে আরও কম ধরছি। তাহলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে যে ১২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। আদার প্রভিন্সেসে আসি এবার। ২৯৭। গড় শো হচ্ছে চারদিন। ১১৮৮। আর ধরুন তিনহাজার দর্শক, কমপক্ষে। তাহলে হচ্ছে ৩৫ লক্ষ ৬৪ আমার দর্শক, গড় টিকিট তিনটাকা, আরও কম করে ধরছি। তাহলে দাঁড়াচ্ছে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। টোটাল দাঁড়াচ্ছে আমার, আপনাকে বলছি, ওয়েস্ট বেঙ্গলে হচ্ছে ৫১ কোটি ৬১ লক্ষ, আসামে ১২ কোটি ৮০ লক্ষ,আদার প্রভিন্সেসে হচ্ছে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৯২ হাজার, টোটাল হচ্ছে ৬৫ কোটি ৪৭ লক্ষ ৯২ হাজার– এই টাকার টিকিট বিক্রি হয়, যাত্রার টিকিট এবং এই ইন্ডাস্ট্রিকে আমাদের দেশের মানুষ এত ভালোবাসে যে তাঁরা এই টিকিটটা কেনেন। অন্য কোন শিল্প – আমার মনে হয় –পারফর্মিং আর্টস– এক হিন্দি সিনেমা বাদ দিলে, আমার মনে হয়না এত টাকা পে-ইন করতে পারে ভারতবর্ষে এমন কোন আর্ট ইন্ডাস্ট্রি নেই। তৃতীয়ত হচ্ছে, আমাদের টোটাল দর্শকের একটা হিসেব করা যাক - টোটাল দর্শক কত। ওয়েস্ট বেঙ্গলে ১০ কোটি ৯৬ লক্ষ ২০ হাজার, আসামে ৩ কোটি ২০ লক্ষ আর অন্যান্য প্রভিন্সে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৯২ হাজার। তার মানে, আমার হচ্ছে, ১৫ কোটি ২৩ লক্ষ ১২ হাজার দর্শক আমার যাত্রা প্রতিবছর দেখেন। টোটাল নায়েকের সংখ্যা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ১ হাজার ৫৬৬, আসামে ১ হাজার ২৮০, আদার প্রভিন্সে ২৯৭। ৩১৪৩–টোটাল নায়েক সংখ্যা। কলকাতা শহরে – এগুলো খুব একটা নীরস ব্যাপার হচ্ছে -কিন্তু এটা একটা রেকর্ডেড থাকা দরকার। তার কারণ হচ্ছে যে, ফিল্মের লোকেরা আমাদের খুব ছোট চোখে দেখে বা অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রির লোকেরাও ছোট চোখে দেখে। আমার একটা ছোট্ট স্মৃতির কথা মনে আছে। আমাদের নাটকের একজন বিখ্যাত লোক, নাট্যশিল্পী, তিনি একদা মঞ্চ অধিকার করে ছিলেন। তাঁকে আমি একদিন বলেছিলাম, তাঁর মঞ্চের অবস্থা খুব খারাপ গেলে, তাকে বলেছিলাম যে, মঞ্চটা তো চলছে না, তো দিয়ে দিলে আমার ভালো হয়। আমি ক'দিন যাত্রা উৎসব করাই। তো উনি আমাকে শুনে বললেন, যাত্রা ! এঃ! মশাই আপনি একটা শিক্ষিত লোক, একটা সাহিত্যিক লোক, যাত্রাফাত্রা করাবেন? এখানে তো মুচি-মুদ্দোফরাস ঢুকে যাবে, তারপরে এই স্টেজে কোন ভদ্রলোক ঢুকবে? তা আমি উঠলাম, উঠে বললাম, মশাই, খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, ঈশ্বর কার কপালে কি লিখেছেন বলা যায় না – এমনও তো হতে পারে যে যাত্রার ভাত আপনার পেটে যাবে! এখন বলাই বাহুল্য, তিনি কিন্তু যাত্রার ভাত খান। আমার কার্য্যালয়ে, মানে আনন্দবাজার

পত্রিকা অফিসে আমাকে নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট টন্ট করা হোত। উনি সেটা জানেন কিছু কিছু। সিনেমার লোকেরা, থিয়েটারেরলোকেরা আমাকে খুব ঘৃণা করত – যাত্রা-টাত্রার ব্যাপার তো। অতি জঘন্য মুচিমুদ্দোফরাসের ব্যাপার। কুলি-টুলিদের ব্যাপার। এই কথা বলা হোত। যাই হোক, এটা একটা জেদেরও কারণ ছিল আমার। তা ধরুন তখন, আজকে আমার আনন্দবাজার পত্রিকা, শুধুমাত্র যাত্রার বিজ্ঞাপন থেকে ১ কোটি টাকা পায় বছরে। সুতরাং, আজকে আমি যে কোন স্টাফকে ধরে বলতে পারি যে, তোর পেটে যাত্রার ভাত আছে। এই কলকাতা শহর, যাত্রা নিয়ে যখন আমি প্রথম লিখতে শুরু করি, তখন অবশ্য আমার কোম্পানীর খুব একটা অমত ছিল। খুব একটা ইন্টারেস্ট ছিল না। কিন্তু যখনই আমি বলেছি যে, এটা একটা দারুণ মিডিয়া, এইটা যদি একটা ব্যবসায়িক মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে এর থেকে প্রচুর টাকা সংবাদপত্র ইনকাম করতে পারে। এটা আমার মনে হচ্ছে। আমাকে একবছরের জন্য চান্স দেওয়া হোক। সেই চান্সটা আমাকে দেওয়া হয়েছিল। আমি লিখতেই সে অনুভব করেছি যে, শুধুমাত্র লিখে একটা জিনিসকে বড় করা যায় না। তার জন্য আমার একটা সংগঠন চাই। কি? না, শোভাবাজার রাজবাড়ি। শোভাবাজার রাজবাড়িতে একা আমি যাত্রা উৎসব করেছিলাম। আমার সঙ্গে আমার বন্ধুরা অনেকেই ছিলেন। তারা অনেকে ঘেন্নায় লজ্জায় উৎসবে যাননি। তাঁরা নাটকের বন্ধুরা। তারা অনেকে আবার আজকে যাত্রাও করছেন। বললেই ওরে বাপ রে! ওরে টিকিট কেটে দে রে! আমি খুবই কৃতজ্ঞ উনি টিকিট কেটে দেখেছেন, আমাকে কোনদিন ছোট মনে করেননি।

প্রতিভা অগ্রবাল

আচ্ছা, এই অ্যাটিচুডটা কিন্তু কেন ছিল, আপনার কি মনে হয়? কেন এই থিয়েটারের ফিল্মের লোকেরা যাত্রায়

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

জানেন তো, একটা জিনিস যে, আমাদের দেশে যতই বামপন্থী হাওয়া হোক, আমরা যতই বলিনা কেন, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা, কিন্তু গ্রামকে তো এখনো আমরা এখনো প্রাধান্য দিতে শিখিনি। একটা গ্রামের শিল্প শহরকে অধিকার করবে, এইটেই সহ্য হচ্ছে না। তারপর এর পিছনে একটা বিশাল জনসমর্থন আছে। যেটা ধরুন আজকে যারা যাত্রা করতে এসেছেন, ও তো সবচাইতে ভালো জানেন, এই অসিতবাবু এখানে আছেন, অসিতবাবুর তো প্রায় সাত-আট বছর – মোর দ্যান টেন ইয়ারস না? দশবছরের অভিজ্ঞতা, তিনি আরো ভালো বলতে পারবেন যে, তিনি ওখান থেকে এসে এখানে কি দেখছেন, সেটা ভালো করে বলতে পারবেন। তাপসবাবু বলুন, কনিষ্ক [xiii] আছে, কনিষ্ক বলতে পারবে। ওকেও – কিছুদিন ধরে যাত্রার দলে ও আছে। আচ্ছা, যাই হক না কেন, আসলে আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে গোড়া থেকেই যে, সমস্ত শিল্পের শেষ কথাটা কি? সমস্ত শিল্পের শেষ কথা হচ্ছে মানুষ। সমস্ত শিল্প মানুষের মধ্যে নেমে আসার চেষ্টা করছে। আজকে ফিল্মকে ভাবতে হচ্ছে যে – আচ্ছা, পর্দায় যখন ছবিটা হয়, তখন বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির আমেজটা কি দর্শকের মধ্যে দেওয়া যায় ? অথবা ফিল্মে যদি একটা ফুল ফোটে, সেই গন্ধটা কি দর্শকদের নাকে দেওয়া যায়? তার মানে ফিল্ম মানুষের মধ্যে নেমে আসতে চাইছে। কিন্তু যে শিল্পকলাটা মানুষের মধ্যেই ছিল, মানুষের মধ্যেই তার জন্ম, মানুষের বুকের কাছে লালিত পালিত। আমরা তাকে চিরকাল ধরে অবজ্ঞা করে এসেছি। এ গ্রামের ছেলে, গ্রামের ছেলে। সুতরাং, আমার একটা প্রতিজ্ঞা ছিল যে গ্রামের ছেলেকে দিয়ে আমি শহর অধিকার করব। সেইজন্য শোভাবাজার রাজবাড়িতে যাত্রা উৎসব একার প্রচেষ্টায়। আমি এইখানে একটা ঘটনা বলি যে, বহু চেষ্টা করেছি, যাত্রা উৎসবের যখন পারমিশন করতে গেলাম 'বঙ্গীয় নাট্য সংগঠন' বলে একটা অরগ্যানাইজেশন করেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন প্রফুল্লচন্দ্র সেন, তার প্রেসিডেন্ট। ডাঃ রায়ের কাছে গিয়েছিলাম, উনি বললেন আমি অরগ্যানাইজেশন সঙ্গে যুক্ত থাকি না। যাত্রা উৎসব করবো, ডাঃ রায়ের কাছে গেলাম, উনি বললেন, দেখো, যাত্রা-ফাত্রা আমার রাজ্যে চলবে না। ও সব শহরে-টহরে তুমি এনো না। স্ট্রেট বলে দিলেন - এক্সেম্পশন হবে না। প্রফুল্লদাকে বললাম, প্রফুল্লদা

বললেন, যে তুমি আমায় প্রেসিডেন্টের পোষ্ট থেকে নামিয়ে দাও। আমি বেআইনী কাজ করতে পারি না। অনেক ঘুরে টুরে কালেক্টর-টালেক্টর করে সর্বত্র, অহীনবাবু তখন রবীন্দ্রভারতী মঞ্চে। উনি অ্যাফিলিয়েশনটাই দিলেন না আমার অরগ্যানাইজেশনের। সুতরাং আমাকে হঠাৎ একটা চিঠি লেখা হল যে, দশহাজার টাকা জমা না দিলে আমরা টিকিট ছাড়ছি না। আমি - তখন প্যান্ডেল হয়ে গেছে – আমি জগন্নাথ ভট্টাচার্য বলে একটি ছেলে, সে এখন আমাদের ওখানে কাজ করে, তার হাতে আমার স্ত্রীকে চিঠি লিখে দিলাম যে, আমার তো টাকা পয়সা নেই, কিন্তু দশহাজার টাকা দিতে হবে, তোমার গয়নার বাক্সটা আমাকে দিয়ে রাখো এবং সে অকপটে কিন্তু সেই গয়নার বাক্সটা জগন্নাথের কাছে, তখনও আমি জীবনে কখনো গয়না-টয়না বিক্রি করিনি, বাঁধাও দিইনি জীবনে কখনো। আমি জগন্নাথকে বললাম, জগন্নাথ, এই গয়নাটা কোথাও বাঁধা-টাঁধা দিয়ে যদি পরে টাকা পয়সা হয় ছাড়িয়ে দোব, তুমি আমাকে দশহাজার টাকা এনে দাও। কত গয়না আছে, কত ভরি, তাও জানি না। জগন্নাথ সেই গয়নাটা নিয়ে, জগন্নাথ আর একটি ছেলে আছে দিল্লীতে, দীপক রায়, এরা গিয়ে সেই দশহাজার টাকা এনে দিল। দশহাজার টাকা আমি জমা দিয়ে দিলাম। জমা দিয়ে তখন দিল্লীতে আমার এক বন্ধু আছে, তার থ্রু-তেআমি নেহেরুর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম। উনি আমাকে ৭ মিনিট সময় দিয়েছিলেন। আমি দিল্লীতে গেলাম। ৭ মিনিটের জায়গায় ১৭ মিনিট কথা হল। আমি তাকে একটা কথাই বললুম যে, দেখুন, একটা দেশের ঐতিহ্য, একটা দেশের সভ্যতা - একটা দেশের সভ্যতা কতদূর এগোয় সেটা আমরা কোত্থেকে জানতে পারি, আমরা পেছনটা না তাকালে জানতে পারি না। কাজেই একটা সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার অতীত এবং বর্তমান আর ভবিষ্যত – সবটাই বাঁচিয়ে রাখতে হয়। সব দেশে, সোভিয়েত রাশিয়া, চিন এবং সমস্ত প্রগতিশীল দেশে, তারা ফোক কালচারকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের এইক্ষেত্রে কিন্তু একটা গোলমাল হচ্ছে,ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট আমাদের পারমিশান দিচ্ছে না। তা আমার সরকারের কাছে কি আমি এটা প্রত্যাশা করতে পারি যে আমাকে এক্সেম্পশান দেওয়া হবে? উনি বললেন, নিশ্চয়ই। তারপরে হাক্সারকে ডাকলেন, বললেন যে, ওকে একটা চিঠি করে দাও। সেই চিঠি নিয়ে আমি চলে এলাম এবং প্রফুল্ল সেন মশায়কে এসে দেখালাম, তারপর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এক্সেম্পশান হয়ে গেল এবং যাত্রা আমি করতে লাগলাম। যাই হোক, সেই প্রথম কলকাতা শহরে আমরা দেখেছি যে, এক টাকার টিকিট নষ্ট কোম্পানীর 'লোহার জাল'এর দিন চল্লিশ টাকায় বিক্রি হয়েছে। তখন 'সোনাই দীঘি' হয়েছে, জ্যোৎস্না ওখানে অভিনয় করেছে। তখন বহু লোক। ভাবা যায়নি যে এইরকম একটা প্রচন্ড ব্যাপার হবে। কিন্তু যাত্রার দলের লোকদের নিয়ে আমি যখন মিটিং করেছিলাম, ওরা বলল, দাদা, হবে না। তার কারণ হচ্ছে যে, কলকাতার বাজারে-টাজারে যাত্রা হয়, ভদ্রলোকে টিকিট কেটে দেখবে? আমি বললাম, দেখ, ইষ্টবেঙ্গল পিপল, যারা ১৯৪৭-এর পর থেকে কলকাতা এবং শহরতলীতে এসে বসেছে, তারা তো বাজারে গিয়ে যাত্রা দেখতে পান না, যাত্রা দেখার একটা জায়গা চাই। একটা ফেষ্টিভ্যাল করলে তারা টিকিট কেটে আসবে। সেটা প্রমাণিত হল, শোভাবাজার রাজবাটীতে। তারপর আজকে ধরুন, সেই ১৯৬১ সাল থেকে এই মোটামুটি বাইশ-তেইশ বছরে আমরা কলকাতা শহরকে একবারে পুরো গ্রিপের মধ্যে নিয়ে ফেলেছি। এখন কিন্তু যখন যাত্রা হয় থিয়েটারের টিকিট বিক্রি হয় না। আমার যাত্রা হওয়া মানেই হাউসফুল। ডে-টাইমে যাত্রা হওয়া মানেই হাউস ফুল। একটার সময় থিয়েটার ডে-তে পরপর পরপর তিনদিন হাউস ফুল, তিনটে শো করে দেখেছি, তিনটেই হাউসফুল। তার মানে, মানুষ একটা জিনিষ বুঝেছে যে, শিল্পের শুচিতা, শিল্পের পবিত্রতা এবং শিল্পের মানবতা, মানবপ্রেমিকতা – এই সমস্ত মিলে ব্যাপারটা যাত্রার মধ্যে আছে। যাত্রার আর একটা জিনিস আছে যাত্রা কেন মানুষের এত ভালো লাগে এখানে প্রশ্ন হতে পারে। যাত্রা ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে যে এইবার আমাদের জীবনে চলে আসি। আমাদের জীবন থেকে অনেকগুলো জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে। কি হারাচ্ছে? ভালোবাসা, মায়া, মমতা, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব। সম্পর্কটা ক্রমশঃ আলগা হয়ে যাচ্ছে। আর কি যাচ্ছে? আর যাচ্ছে উত্তেজনাটা।

জীবনের কোথাও উত্তেজনা নেই। দেখবেন লক্ষ লক্ষ লোক টিকিট কেটে খেলার মাঠের দিকে ছোটে – কি কারণে? কিছু পয়সায় উত্তেজনা যদি কেনা যায়। তাহলে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আমার কি রাখা দরকার? আমার ইন্ডাস্ট্রি, এই যাত্রা ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু পুরোপুরি বলছে যে, মানুষকে ভালোবাসো। আমরা বলছি, ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্ক যতই আলাদা হোক, রক্তের সম্পর্ক। সুতরাং একদিন মিলবেই। এই কতকগুলো ভ্যালুসকে, পুরোন ভ্যালুসকে, আমরা কিন্তু রেখে দিচ্ছি। পৃথিবী যতই পালটে যাক, ওই ভ্যালুসগুলোকে আমরা কিন্তু চেঞ্জকরছি না। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই এখন। নট্ট কোম্পানীর গত বছরের আগের বছর বই হোল তাতে একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল, ভৈরববাবুর পালা, তাতে করা হয়েছিল যে, এ্যাকটর এবং এ্যাকট্রেসরা মাঝে মাঝে এ্যাক্টিং এরিয়া থেকে বেরিয়ে আসবেন। বেরিয়ে এসে বলবেন যে, "আমি অমুক, এতক্ষণ অমুকের অভিনয় করছিলাম। এই প্রব্লেমটা এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এইবার আপনারা বলুন কোথায় কি যাবো?" দর্শক বলবেনা। কারণ ওখানে আশি হাজার দর্শক বসে আছে। এবারে ঢুকলো, তারপরে গল্পটা চললো আর কি। তো এই করে একজন অসৎ ছেলে সে একটি মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে, তার স্বামীকে - বিয়ের আসরে তার স্বামীকে পাগল করে দেবে। পাগল প্রতিপন্ন করল, টাকা দিয়ে তার আত্মীয়স্বজনকে ধরল এবং সে এ্যাক্টিং এরিয়া থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "দেখলেন তো, আমার পয়সা আছে, সুতরাং আমি কি রকম করে দিলাম, লোকটাকে পাগল করে দিলাম, মেয়েটাকে এবার আমি বিয়ে করব। আপনারা অনুমতি করুন আমি বিয়ের পিঁড়িতে বসি।" মাখনবাবু দৌড়ে ছুটে এলেন। বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদা। নিচ্ছে না। আমি পর পর তিনদিন দলে থাকলাম, নিচ্ছে না। কোলিয়ারী ফিল্ডে অনিল ভান্ডারীর নাম শুনেছেন। আমরা ওকে বলি কোলিয়ারী লর্ড। উনিও কিন্তু খুব ছোটবেলা থেকে ঐ সাইকেল রিক্সা করে নায়েকের বাড়ি গিয়ে কন্ট্র্যাক্ট করে উনিও সঙ্গে ব্যবসা করেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে উনি অনেক কাজ করেছেন। যাই হোক, তা অনিলবাবুর ওখানে যাত্রা উৎসব হোল। সেইখানে নট্ট কোম্পানীর বই, আমি সেখানে বসে আছি। কোলিয়ারী ফিল্ডের যত big officers, proprietors, এইসমস্ত লোকেরা এসেছেন নট্ট কোম্পানীর যাত্রা দেখতে। তো যাত্রা যখন শেষ হল, তখন তাঁরা আমাকে বললেন যে, প্রবোধবাবু, এটা কি হোল? যাত্রার একটা educative value আছে, একটা লোক অন্যায় করে চলে যাবে? কিন্তু এই যারা আমার দর্শক তারা কিন্তু প্রত্যেকেই ঐ চরিত্রের প্রতি – তারা প্রত্যেকে অন্যায় করে, অন্যায় করে যাচ্ছে, কিন্তু তারা বিবেকের দিক থেকে চাইছেন যে আমারও শাস্তি হোক। নেক্সট আসরে গেলাম মেদিনীপুরে। আমি গিয়ে বললাম যে, "বেলা তুই এবার এ্যাক্টিং এরিয়া থেকে বেরিয়ে বল যে, আমার স্বামীকে তো ও পাগল প্রতিপন্ন করল, এবার আমি, আপনাদের কাছে অনুমতি নিয়ে এবার পাগল হয়ে যাচ্ছি – তুই এবার চিৎকার করে হাস – হাঃ হাঃ হাঃ করে হাস। তাহলে যদি দর্শক নেয়।" নিল না। তিনটে আসরে। তারপরে শেষ পর্যন্ত করা হোল কি যে ঐ লোকটা যখন বলছে যে, এ্যাক্টিং এরিয়ায় ঢুকবে, তখন তার বাপকে চাকর করে রেখেছে, সে একটা যা যা - বন্দুক পরিষ্কার করছিল, আমি বললাম বন্দুকটা রেখে দাও। ও বেরিয়ে যাবে, বাপ বন্দুকটা নেবে। এবার ও এ্যাক্টিং এরিয়ায় বলছে যে, "তাহলে আপনারা অনুমতি করুন, আমি গিয়ে আসরে বসি।"এ্যাক্টিং এরিয়ায় ঢুকছে, বাপ বন্দুক নিয়ে এল, ঢাঁই করে গুলি করল। আশি নব্বই হাজার দর্শক হৈ হৈ করে চিৎকার করে উঠল। এই, এই হচ্ছে যাত্রা। তার মানে একটা জিনিস এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা কতগুলো মূল্যবান সংস্কার থেকে দূরে সরে যেতে পারছিনা। এটা ভারতবর্ষের মাটি, ভারতবর্ষের হাওয়া, ভারতবর্ষের গাছপালা, মানুষ সমস্ত মিলিয়ে যে ব্যাপারটা, ভারতের যে মর্মবাণী, সেটাই এর মধ্যে নিহিত আছে। অর্থাৎ একজন লোক পাপ করে কখনো পরিত্রাণ পেতে পারে না। এটাই হচ্ছে আমাদের যাত্রার শেষ কথা। সঙ্গে সঙ্গে রিলেশনগুলো কিরকম দেখুন, আজকের রিলেশনসটা আমার নিজের উদাহরণ দিয়ে বলছি – আমার বাবা ছোটবেলায় আঙুল কেটে গিয়েছিল তো আমরা সাতজন ভাইবোনে মিলে চিৎকার করেছি, বাবা বুঝি মরে গেল। তো আঙুল কেটে রক্ত বেরিয়েছিল। আমরা সবাই

মিলে কাঁদতে লেগেছি। আমার ছেলে, দুই ছেলে, এক মেয়ে, আমার যখন স্ট্রোক হোল, তারা তো হাসপাতালে একদিন গিয়ে – বাবু, ভালো আছো তো? ব্যাস! বলে চলে এল। তা আমার বোনরা সবাই বলল, বাবা অসুস্থ, যা। বলল, তা, কি অসুস্থ, অসুখ করেছে, হাসপাতালে আছে, ভালো ব্যবস্থা আছে, ভালো হয়ে যাবে। মানে এই যে সম্পর্কটা, টানটা দেখুন, কি ভাবেই কমে যাচ্ছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, সন্তানের প্রতি পিতার, পিতার প্রতি সন্তানের, মাতার প্রতি সন্তানের ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে বন্ধু-বান্ধব, অমুক-তমুক, আমরা ক্রমশ মেকানাইজড হয়ে যাচ্ছি। এই যান্ত্রিক যুগে হৃদয়ের কোনো দাম থাকছে না। আমি কিন্তু সেই হৃদয় নিয়ে কারবার করছি। লক্ষ লক্ষ লোককে বলছি হৃদয়ের কথা, অন্তরের কথা। এর মধ্যে এখনো ধুকপুক করছে। যন্ত্র সত্য, কিন্তু আসল সত্যটা হচ্ছে এইখানে। এইখানে পরমব্রক্ষ যেখানে বাস করেন, তিনি এইখানে, এইখানে হচ্ছে হৃদয়, এটা যন্ত্র। সুতরাং মানুষ হচ্ছে শেষ কথা, মানুষ হচ্ছে প্রথম কথা। এই যাত্রার উত্তরটি মানুষের মধ্যে, মানুষের মধ্যেই সে ছিল। এখন, আপনারা বলতে পারেন যে, এই ইন্ডাস্ট্রির পরিণতিটা কি? এর ভবিষ্যতটা কি? ভবিষ্যৎ বলা খুব মুশকিল। কারণ, পৃথিবীতে, আমি আগেই একটা জায়গায় বললাম যে, কিছু থাকে না। কিছুই থাকেনা। যদি থাকতো, তাহলে ধরুন, সেইকালে যখন আই পি টি এ হয়েছিল, আই পি টি এতোআজকে সারা ভারতবর্ষে একটা আলাদা চেহারা করে নিতে পারতো। কিন্তু কিছু লোক, তাদের সঙ্গে মতদ্বৈততা হল না, তারা বেরিয়ে গেলেন। আই পি টি এর প্ল্যাটফর্মটাকে ব্যবহার করলেন, নিজেদের খ্যাতি কুড়োলেন, চলে গেলেন। এইভাবে বহু শিল্প-আন্দোলন, বহু আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন এইভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, একথা আমি কখনোই জোর দিয়ে বলতে পারিনা যে যাত্রা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জিতবে। কিন্তু একটা জিনিস আমি জানি, যে যাত্রা যদি ঐ মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকে সবসময়ই, তাহলে তার মৃত্যু নেই। অন্য সমস্ত শিল্প মরে যাবে, কিন্তু যাত্রা বাঁচবে। তার কারণ, আমাদের দেশে সাধারণত বলা হয় যে, গ্রামের লোকেরা কালচারালি ব্লাইন্ড। অশিক্ষিত বলা হয় তাদের। অথচ আমি ধরুন, মোটামুটিভাবে একশ রাত্রি গ্রামে থাকি। গ্রামে যে লুঙি তোলা লোকটা বসে আছে, তার পাশে গিয়ে বসি। সে লোকটা যখন সমালোচনা করে, দেখি, একটা বারো বছরের ছেলে আমার পাশে বসে সমালোচনা করছে। ওর জিভটা খুব আড়ষ্ট, বলছে ---- তাহলে, আমার মনে আছে, সূর্যবাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, মশাই, লোকে বলে যে, যাত্রায় খুব অশিক্ষিত লোকের ভিড়, সূর্যবাবু বললেন, ডেফিনেশনটা দিয়ে তুমি ব্যাখ্যাটা করুন না অশিক্ষিত মানেটা কি? আপনি কি ইউনিভার্সিটির ডিগ্রির কথা বলছেন, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশানের কথা বলছেন? না কি আর্টের দিক থেকে আমরা কতটা উন্নত, শিক্ষিত এইটা বলছেন? আমি বললাম দুটোই বলছি। বললো, তা যদি বলেন, যে শিক্ষিত ব্যক্তি, যারা স্কুল-কলেজে পড়ে শিক্ষিত, তাদের সংখ্যা আমাদের যাত্রাতে বরাবরই বেশী ছিল, অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রির চাইতে এবং আজও আছে। আর যদি বলেন যে, শিল্পবোধে, শিল্পশিক্ষায়, শিল্পগ্রহণে তাহলেও আমরা সবচাইতে বড়। এত বড় অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পীগোষ্ঠী অন্য কোথাও নেই। তো এই যে লোকগুলো, আমরা বলি অশিক্ষিত, যে লোকটা দেখুন সে তার বংশগতভাবে যাত্রা দেখছে, যাত্রা দেখে দেখে চট্ করে বারো বছরের ছেলে বর্ণালীকে দেখে বলল, আরে এ তো বর্ণালী ব্যানার্জি, ওর জিভটা একটু আড়ষ্ট মনে হয় – তাহলে কিভাবে ব্যাপারটা এসেছে? একটা ডায়লগ বলতে গিয়ে একটু থেমে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা বুড়ো লোক বলছে ডায়লগটা আটকে গেল, বাই ধরুণ। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে, দেখুন, অল্প মানুষ আর বেশী মানুষ। সেটা ব্যাপার আছে। যে বেশী মানুষের ব্যাপারটাই হচ্ছে খুব স্থূল ব্যাপার। আমাদের যাত্রার অনেক লোক। অনেক লোক হচ্ছে, তার মানেই হচ্ছে একটা হস্তিমূর্খ। এই যে বিশাল লোক মিলে যে একটা লোক, সে একটু মোটাসোটা বেশ। যেমন ধরুন, রাজনীতি-টীতি করেন, রাজনীতির ব্যবসা করেন, অনেক লোক নিয়ে ব্যবসা করেন তো, তারা আস্তে আস্তে মোটা হতে থাকেন। মন্ত্রী-টন্ত্রি হলে মোটা হন। ঠিক তেমনই, যারা শিল্প নিয়েও জীবনযাপন করেন তাদের ক্ষেত্রেও প্রায় এরকমই দেখা যায়। ঐ আস্তে

আস্তে আস্তে আস্তে মোটা হয়। সুতরাং, যাত্রার ব্যাপারটা হোল অনেকগুলো লোক নিয়ে একটা মোটা হওয়ার ব্যাপার। তা মাথাটাও---কিন্তু বুদ্ধিটা কিছু মোটা হয়। কিন্তু যারা আমার দর্শক, তারা দিনের পর দিন ধরে ভালো চাষ করে। তারা জাপানী প্রথায় চাষ করতে জানে। আধুনিক কালটিভেশনটা তারা জানে। তারা ফসল তিনবার কি করে ফলাতে হয় জানে। তারা স্কিল্ড। একটা লোক কারখানায় কাজ করে –স্কিলড্ লেবার। সে লোকটা যাত্রা দেখে। যাত্রা সম্বন্ধে সে আদি-অন্ত বলে দিতে পারে। কেমন? তাকে আমরা অশিক্ষিত বলছি। আমরা বলতে পারি কি অস্বাক্ষর। লিখতে জানে না এই বলতে পারি। কিন্তু অশিক্ষিত কথাটা বলতে পারি না। এই যে বললাম গ্রামের যাত্রাকে অবহেলা করার পেছনে এই ব্যাপারটা কাজ করেছে। যে এটা একটা গ্রামীন শিল্প, সুতরাং এর কলকাতার সভ্যজগতে প্রবেশের অধিকার নেই। আমি ছ'খন্ডে একটা বই লিখছি। 'চিৎপুর চরিত্র'। দু'হাজার চরিত্র নিয়ে টোটাল বইটা লেখা হচ্ছে। তাতে একটা জায়গায় বলা আছে, এরকম ছিল যে, বড় ফণীবাবু বলছেন যে, টাটানগরে যাত্রা হচ্ছে, তখন আমরা খাচ্ছি বসে, সবাই মিলে, কতকগুলো ছেলেমেয়ে পাশে বসে দাঁড়িয়ে থেকে, তো বললে দেখ, দেখ, দেখ যাত্রাওয়ালারা কিরকম মানুষের মত খায়! It was the day! কেমন? কে যায়? না আমরা যাত্রাওয়ালা। ভেতর থেকে কে যেন বলল, ও আমি ভেবেছিলাম মানুষ বুঝি। এরকম ছিল একসময়। ছিলনা তা নয়। ধরুন, আদিকালে, আমরা যদি একদম আগে চলে যাই, খ্রীষ্টের জন্মের দশহাজার বছর আগে, অথবা পুরাণের যুগে যদি চলে যাই তাহলেও দেখব যে একটা শ্রেণী ছিল, যাদের কাজই ছিল অভিনয় করা। তারা নৌকোতে ঘুরে বেড়াতেন। অপ্সরা বলুন, গন্ধর্ব বলুন- এই যে একটা শ্রেণী ছিল, তারা একজন মুনিকে মোহিত করে নিয়ে চলে যেতে পারেন, তাদের ব্যবসাই ছিল এ্যাক্টিং করা। আমি একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি, এখানে প্রশ্ন থাকতে পারে যে, অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, যাত্রা এবং থিয়েটার – প্রথম কে?

আমরা নাট্যশাস্ত্র নিয়ে পড়ে একটা জিনিস জেনেছি যে, ব্রহ্মাকে বলা হল যে, আপনি একটা নাটক রচনা করুন এবং আমরা সেটা অভিনয় করি। তো ব্রহ্মা নাটক রচনা করলেন। ব্রহ্মা নাটক রচনা করার পর ইন্দ্রকে ডাকলেন। ইন্দ্রকে ডেকে বললেন, তুমি এটাকে ডিরেকশন-টিরেকশন দিয়ে এটাকে প্রোডিউস করো। ইন্দ্র বললেন যে, আমরা, দেবতারা, মানে আর্যরা, এই প্রসঙ্গে কিছুই জানি না। তখন ব্রহ্মাকে ভরতমুনিকে ডাকতে হোল। ভরতমুনি শতপুত্র নিয়ে এলেন। মানে, তখনকার যাত্রাদলে একশোটা লোক থাকতো- আজও লাগে। ভরতমুনি তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে এসে অভিনয়টা করলেন। কিন্তু সেই পাঁচটা অভিনয় তখন ভেঙে গিয়েছিল। সেই অভিনয়টা ভাঙবার পর ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে ডেকে বললেন যে, একটা নাট্যগৃহ রচনা কোর। যেখানে অনার্যরা আর বাধা দিতে পারবে না। অনার্যদের কি ডিমান্ড ছিল? না, আমাদের আর্টফর্মটা তোমরা নিচ্ছ কেন? মানে ভারতীয়রা, অরিজিনাল ভারতীয়রা। এইবার মঞ্চগৃহ রচনা হোল, তার মধ্যে নাটক অনুষ্ঠান হতে লাগল। তার মধ্যে ইন্দ্র ধ্বজ-টজ অনেক ব্যাপার আছে, সে এক বিশাল ব্যাপার। এখানে আলোচনার বিষয় নয়। এখন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ব্রহ্মা যে নাটকটি রচনা করেছিলেন, তার প্রথম পাঁচটি অভিনয় কোথায় হয়েছিল ঐ মঞ্চগৃহটি হবার আগে। তার মানে একটা গৃহের বাইরে, মুক্ত অঙ্গনে। তার মানে অরিজিনালি যাত্রাই প্রথম, প্রধান। যাত্রাই হচ্ছে ফাদার। যাত্রাই হচ্ছে মাদার।যাত্রা থেকেই সমস্ত অভিনয় শিল্প উদ্ভূত, এটা আমার বিশ্বাস। আচ্ছা, খুব দীর্ঘ বক্তৃতা হয়ে গেছে। বোধহয় আমি সংক্ষেপে বোঝাতে পেরেছি খানিকটা। এরপরে যদি কারও কোনো প্রশ্ন থাকে পরে বলবো। আপাতত আমার মনে হয় যে জ্যোৎস্না তার অভিজ্ঞতার কথা এবং যাত্রা কোথায় ছিল, কি ভাবে এল – এটা জ্যোৎস্না বলুক। তারপরে আমরা অন্য জায়গায় যাবো। ও কে আমাদের দর্শক, কোটি কোটি দর্শক যাত্রার সম্রাজ্ঞী বলে----

জ্যোৎস্না দত্ত

আমি আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে যাত্রায় এসেছি। যখন যাত্রায় প্রথম এলাম, তখন এই দাদা মানে প্রবোধদা যে কথা বললেন, আমি এসেও অনেক কষ্ট পেয়েছি। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমাদের, আর সেই সময় যারা এসেছেন তাঁদের অনেককেই কষ্ট করতে হয়েছে। বহু জায়গায় হেঁটেও যেতে হয়েছে আমাদের, গোরুর গাড়িতেও যেতে হয়েছে, এখন অবশ্য সরকার গ্রাম-গঞ্জের রাস্তা-টাস্তা করে দিয়েছেন, সেই দিক থেকে আমাদের খুবই সুবিধে হয়েছে যাওয়া আসা করার। আর অভিনয়টা আগেও যেমন ভালোবাসতো গ্রামের লোক বা শহরের লোক, এখনো আরো বেশী ভালোবাসে। আমার মনে হয় সবচেয়ে প্রধান কারণ হচ্ছে যে, কলকাতায় বা কোনো শহরে এসে তাদের, ভালো সিনেমা বলুন, ভালো থিয়েটার বলুন, এগুলো এসে দেখতে হয়। আর আমরা, যাত্রাদলে যারা অভিনয় করি, তারা গিয়ে, তাদের বাড়ির সামনে গিয়ে আমরা দেখিয়ে আসি। এ একটা মস্ত বড় সুবিধে। আগের থেকে যে অনেক ভালো হয়েছে সেটা আপনারা প্রত্যেকেই জানেন। প্রত্যেকেই দেখছেন। এর বেশী আমি আর কি বলব? যদি আমাকে প্রশ্ন করেন তাহলে হয়তো আমি উত্তর দিতে পারি কিছু। আমায় যদি কেউ কিছু প্রশ্ন করেন তো করুন।

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

আচ্ছা, আমি প্রশ্ন করি। তুমি তো যাত্রায় প্রথম মহিলা অভিনেত্রী। তুমি যখন প্রথম এলে, তখন এই যাত্রার অবস্থাটা কেমন ছিল?

জ্যোৎস্না দত্ত

অবস্থাটা বলতে কি বলছেন বলুন?

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

তখনকার ক'টা দল ছিল, তখনকার এ্যাক্টিং-এর ধারাটা কি ছিল, তখন এ্যাক্টিংটা কি ছিল?

জ্যোৎস্না দত্ত

এ্যাক্টিংটা তখন সুরে ছিল। তার কারণ তখন এই প্রথাই চলেছিল। এখন সেটা কিছুদিন হল পালটে গেছে। আমরা খুব সাধারণভাবে বাড়িতে যেমন কথাবার্তা বলি সেই ধরণের অভিনয় হচ্ছে। তবে তখন তো আমাদের খালি গলায় অভিনয় করতে হোত, তার ফলে সুরে অভিনয়টা থাকলে আমাদের দিক থেকে অনেক সুবিধে ছিল। আর এখন জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, শ্রোতা বলুন, দর্শক বলুন, প্রচুর বেড়ে গেছে, কারণ আমাদের দেশে মানুষের সংখ্যাও তো অনেক বেড়ে গেছে, সেই হিসেবে আমাদের শ্রোতার সংখ্যাও বেড়েছে। এখন মাইকটা আসাতে সেই

দিক থেকে আমাদের খুব সুবিধে হয়েছে। শুধু মাইক নয়, লাইট, তাতেও সুবিধে হয়েছে। তখন আমরা ডে-লাইটে অভিনয় করতাম। ডে-লাইট বলুন, হ্যাজাক বলুন, ধরিয়ে দিত। তাতে দর্শকের খুব একটা অসুবিধে হোত না। কারণ এত দর্শক তো তখন থাকত না। এখন যেমন এক-একটা প্যান্ডেলে ১৮ হাজার, ২০ হাজার, ৩০ হাজারও লোক দেখতে পাই আমরা। তারা হয়তো বহুদূর থেকে আমাদের নাক-চোখগুলো ভাল দেখতে পান না। কিন্তু এখন আলো আসাতে স্পট বলুন ইত্যাদি যে লাইটের ব্যবহার হচ্ছে আর কি, প্রয়োজন মতো সেগুলো থাকাতে আমার মনে হয় যে, তাতে তাদের দেখার পক্ষে খুব সুবিধে হয়।

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

তখনকার নায়েকদের, মানে যেখানে বা যাঁদের কাছে যাত্রা করতে যেতে তখনকার পরিবেশ আর আজকের পরিবেশের ডিফারেন্সটা কোথায়?

জ্যোৎস্না দত্ত

তখনকার পরিবেশটা আলাদা। আমাদের ভেতরে একটা – কারণ একজায়গায় গিয়ে বেশ কয়েকদিন আমরা থাকতাম। সেই গ্রামের সঙ্গে বা শুধু নায়েকদের কথাই বলছিনা, সেই গ্রামের সঙ্গে – ধরুন একটা বাড়িতে আমাদের থাকতে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে এমনই একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠত যে, আমার কাছে এখনও বহু চিঠি আছে তাদের। ছবি আছে। আমার ছবি তাদের কাছে আছে। আসার সময় প্রচন্ড একটা কান্নাকাটি পড়ে যেত। শুধু তাই নয়, এমনও দেখা গেছে যে, সেই সব শিল্পীরা যে সব দলে থাকতো তাদের নেবার জন্য আবার চেষ্টা করতো সামনের বছর, এরকম ব্যাপারও দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, আমি, আমার নিজের দিক থেকে যেটা বলছি, যেটা জেনেছি সেটা বলছি, ছুটি হয়ে যেত, বাড়িতে থাকতাম, তখন হয়তো বহু গ্রাম থেকে আমাদের বাড়িতে আসত। গ্রামের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে আসত। যেমন আনাজপত্র বলুন, মুড়ি-টুড়ি বলুন, ইত্যাদিগুলো নিয়ে আসত। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত, এসে তারাও হয়ত থাকতো দু-এক দিন আমাদের বাড়িতে। এরকম করে প্রচন্ড আত্মীয়তা গড়ে উঠতো। আর সে আত্মীয়তা এখনো আছে। যেমন ধরুন সিয়ারশোল রাজবাড়ির একটা ব্যাপার, আমি কয়েকদিন আগে কাগজে দিয়েছিলাম যে আমি যাত্রায় কবে এসেছি, কোন আসরে আমি প্রথম নায়িকার হলাম, তো সেইটে আমি লিখেছি বলে তাদের যে কি আনন্দ! তারা কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন বা সিয়ারশোলের কাছেও আমরা গিয়েছিলাম, সে রাজবাড়ির লোকেরাও এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে এবং ধন্যবাদ জানিয়ে গেছে।

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

তুমি যে প্রথম নায়িকা হয়েছিলে সে গল্পটা শুনি ---

জ্যোৎস্না দত্ত

আমি নায়িকা হয়েছি খুব মুস্কিলের মধ্যে। মুস্কিলের মধ্যে মানে, আমি ছোটবেলায় তো এককালে ছেলের অভিনয় কোরতাম, তারপরে আস্তে আস্তে বড়বেলায়, নাচ-টাচ কোরতাম, আমি খুব ভালো নাচতে পারতাম। নাচ-গান করতাম। তারপর সত্যম্বর অপেরা আমায় যখন নিল, নিয়ে আসার পর আমাকে গৌরবাবু, মারা গেছেন তিনি, স্বত্বাধিকারী ছিলেন সত্যম্বর অপেরার, তিনি আমাকে একটা পার্ট দিয়ে বললেন যে, এটা মুখস্থ করে রাখবি আর কোলফিল্ডে তুই নাচ-গান করবি। মুখস্থ -টুখস্থ করলাম, কিন্তু তারপরে যিনি মালিক হয়েছিলেন তিনি আমার হাত থেকে পার্টটা কেড়ে নিয়েছেন। সেটা আমার খুব দুঃখের কথা। কেড়ে নিয়েছিলেন, বলেছিলেন, ও তো নাচ করে ও কি পার্ট করবে? তখন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। তারপরে যিনি নায়িকার ভূমিকা করতেন, খুব ভালো অভিনয় করতেন, আর আমি যে আজকে অভিনয় করি সেটা তারই খানিকটা ছায়া। তিনি মধ্যে মধ্যে ডুব মারতেন। নন্দদুলাল অধিকারী - হ্যাঁ, পুরুষ। তখন, আমি যখন এসেছি, তখন সব পুরুষরাই – মানে মহিলার ভূমিকাগুলো

পুরুষরাই করতেন। কিন্তু কেন জানিনা ওনার অভিনয় আমার ভীষণ ভালো লাগত। উনি যখন স্টেজে অভিনয় করতেন, মানে যাত্রার আসরে অভিনয় করতেন, আমি গিয়ে বসে বসে দেখতাম। নন্দরাণী। আমার খুব ভালো লাগত। আর এত একটা ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল সেই ভদ্রলোকের, যে বুড়ো – বুড়ো, রাজা –রাজা, যুবরাজ – যুবরাজ, রাণী – রাণী, যুবরাণী – যুবরাণী সবকিছু করতে পারতেন। এমন একটা ক্ষমতা ছিল। এগুলো অবশ্য সবার মধ্যে থাকে না। এগুলো ঐশ্বরিক ক্ষমতা। সে যাই হোক, উনি বাড়ি গিয়েছিলেন, উনি আর এলেন না। হঠাৎ শোনা গেল যে উনি – তখন আমাদের বাংলাদেশ হয়নি, পাকিস্তান বলতাম আমরা, পাকিস্তানে চলে গেছেন। বাগেরহাটে ওনার বাড়ি। তো উনি এলেন না। সিয়ারশোল রাজবাড়িতে, আমাদের সরস্বতীপূজোর সময় বায়না ছিল। মানে আমাদের পৌষমাসে একটা ছুটি দিত, কারণ গ্রামের লোকেরাই তো বেশী দলে ছিল, সেই ধান-টান কাটার ব্যাপারে সব ওদের নিজেদের গিয়ে জমি দেখাশোনা করতে হোত, এ কারণে একটা ছুটি দেওয়া হোত। তা সরস্বতীপূজোর সময় ওখানে আমাদের বায়না ছিল, হঠাৎ শোনা গেল আমি ছেলেদের সঙ্গে সব সরস্বতীপূজো করব বলে আনন্দ করছি খুব, মাটি-টাটি কাটার ব্যাপার-ট্যাপার করছি, তো হঠাৎ মুখুজ্জে মশাই বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন সত্যম্বরে, বিজয়কৃষ্ণ মুখার্জি, উনি ছিলেন দলের খুব শুভানুধ্যায়ী। উনি আমাকে বললেন, বাবা, খুব বিপদে পড়েছি। আমি বললাম, কি দাদু? না, নন্দ তো আসেনি, তাহলে আজকে কি করে যাত্রা হবে? উনি নায়িকার ভূমিকা করতেন। তো তখন ওনার কাছে কে বলেছে যে, যদি উদ্ধার করতে পারে তো জ্যোৎস্না পারবে। কারণ আমি দেখেছি, গোপনে গোপনে ও পার্ট পড়ে। আমার আবার তখন ছেলেমানুষী বিদ্যে তো, আমায় কি মানাবে কি মানাবে না এটা চিন্তা করতাম না। যে ভূমিকাটা ভালো লাগতো আমি মুখস্থ করতাম। আর বসে বসে দেখে রাখতাম কে কিরকম করছে। এটা আমার একটু অভ্যেস ছিল। তো সে এক ভদ্রলোক দেখেছিলেন, তিনিই বলেছিলেন বিজয়বাবুকে যে ওই একমাত্র পারতে পারে। উনি ডেকে যখন আমাকে বললেন, খুব আদর-টাদর করে বললেন – তখন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। কেন আপনারা তো আমার হাত থেকে পার্ট কেড়ে নিয়েছেন! বলে সে চার আনা পয়সা সে আমার হাতে দিল। বুঝলেন, দিয়ে বলল যে, তুই মিষ্টি খাবি আর বাবু আজকের পার্টটা তুই করে দে। বলে-টলে বললাম ঠিক আছে। আমি তো আর সরস্বতীপূজোর কাছে থাকতে পারলাম না। গিয়ে আবার পার্টটা খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলাম। পড়েটড়ে খুব ঠিক-ঠাক হয়ে নিলাম। এবারে যিনি দলের প্রধান ছিলেন, গুরুপদ ঘোষ, তিনি খুব নেশাটেশা করতেন। সারাদিন উনি কিন্তু কোন খবর নিলেন না যে কে করবে বা কি ব্যাপার। সন্ধেবেলায় গ্রীণরুমে গিয়ে বললেন যে, বাবাঠাকুর, শেফালীর ভূমিকা কে করবে? তা বললেন, জ্যোৎস্না। না, উনি বলতেন, জ্যোচ্ছনা। জ্যোচ্ছনা! সে আবার কে ? মেয়েছেলে? তা বললেন, হ্যাঁ, ওই যে বাচ্ছাটা আছে আমাদের। কই? দেখি, দেখি ---। আমি যে একটা মেয়ে দলে আছি তার হিসেব নেই। হিসেব নেই তাদের। তা সে যাই হোক, দেখলেন – টেখলেন। একেবারে নন্দদা যেরকম ভাবে সাজতেন, আমি ঠিক সেই রকম ভাবে সেজেছি। সেজে-টেজে গিয়ে দাঁড়ালাম। তবে নন্দদা তো খুব লম্বা-টম্বা ছিলেন, আমি এখনও খুব বেঁটে, তখন তো খুব বেঁটে আর রোগা ছিলাম আমি। দেখে-টেখে বললেন, তা, ঠিক আছে। একটা মন্ত্র উনি আমায় দিয়েছিলেন - বাবা, তুমি গালাগাল কর মন্দ কর যাই কর, জোরে বলবে। জোরে বলবে। ঠিক আছে, জোরে বলব। সেই দিনই আমি অভিনয় করে এসে রাজবাড়ির মেয়েরা আমাকে মেডেল দিলেন। সেই দিনই। খুব ভালো হয়েছিল অভিনয় বলল সবাই। তারপরের দিনও আবার ওইরকম ঠ্যাকার হল। আর উনি যে যে ভূমিকাগুলো করতেন ঐগুলো আমি করতে লাগলাম। তারপরে উনি ফিরে এলেন।ফিরে এসে দেখে উনি বললেন যে, না, আমি আর ওর কাজগুলো করব না। আমি এবার মাদার রোল করব। উনি মায়ের ভূমিকায় চলে গেলেন। আমি ঐ ঠ্যাকায় নায়িকা হলাম। তার পরের বছর পূজো থেকে নন্দগোপাল রায়চৌধুরী –'ছিন্নশির' নাটক লেখা হচ্ছে। তখন উনি আমার জন্য একটা ভূমিকা লিখে দিলেন, কাঁকনবাঈ। ঐখান থেকে ঠিক আমি নায়িকা হলাম আর কি।

বাঁধা বন্দোবস্তোয়। তারপরে আস্তে আস্তে অনেক নাটক করেছি, সোনাই দীঘি হোল, তারপরে এই এখনো অবধি চলেছে।

শ্রোতা

এই যে যাত্রায় ঢুকেছেন তো, তখন ছেলেরা করতো, তা আপনি ঢুকলেন, তখন দর্শক কী রকম নিতে লাগলো?

জ্যোৎস্না দত্ত

দর্শক খুব নিতো---

শ্রোতা

ছেলেরা এতদিন করছিলো----

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

এক মিনিট, ডিস্টার্ব করছি। একটা অদ্ভূত ব্যাপার হচ্ছে কি, যাত্রা দেখতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, পঞ্চাশ হাজার লোক হয়েছে, কতকগুলো আর্টিস্ট আছে যারা আসরে ঢুকলেই একটা গুঞ্জন উঠছে – এই এসেছে ! জ্যোৎস্না হচ্ছে সেই ট্যালেন্টের একজন। যে কতিপয় আর্টিস্ট আসরে ঢুকলে একটা গুঞ্জন ওঠে – জ্যোৎস্না ঢুকলেই – জ্যোৎস্নার একটা গুণ হচ্ছে যে আসর বুঝে, একবার ঢুকল তো, ঢুকে টোটাল ব্যাপারটা দেখে নিল, কি এ্যাক্টিংটা এরা নেবে, সেই এ্যাক্টিংটাও দেখায়। একটু ডিস্টার্ব করলাম।

জ্যোৎস্না দত্ত

তখন সত্যিকারেরই একেবারে যে আমাদের খুব একটা - কেন জানি না, তখন একটু সত্যিকারেরই অসুবিধা ছিল আমাদের পক্ষে। এখন যেমন একটা ‘আসুন আসুন’ ব্যাপার আছে, তখন আসুন আসুন ব্যাপারটা না থাকলেও, তখন আন্তরিকতাটা ছিল খুব। খুব আন্তরিকতা ছিল। তবে ভালমন্দ মিশিয়েই তো জগৎ - তখনও যেমন ছিল এখনও আছে। যেটা দাদা বললেন, যে ‘আমি ভেবেছিলাম মানুষ’ যাত্রাওয়ালারা মানুষ নয়। যেহেতু যাত্রা করে, তারা মানুষ নয়। সেটা এখনও আছে। হয়তো আছে এখনো। তবে আমরা তো মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ অতটা এখন পাই না। কারণ কয়েক ঘন্টার সম্পর্ক হয়। যে জায়গায় আমরা গেলাম, কয়েকঘন্টা। আমরা শো করে গাড়ীতে উঠলাম, মনে করুন, ডায়মন্ড হারবার থেকে টাটা যাচ্ছি, সেইখানে গিয়ে ছ’টায় শো, এবারে হয়তো আড়াইটে-তিনটের সময় নামলাম, নেমে কোনোরকমে হাত-মুখ ধুয়ে কেউ স্নান করে, যাই হোক যার যেমন ইচ্ছে হোল খেল, খেয়ে মেক-আপ-এ বসে গেল। শো শেষ হোল আবার গাড়ীতে উঠলো। সেখানে জনসাধারণের সঙ্গে মেশার যে আগে সুযোগটা আমরা পেতাম সেটা আমরা এখন পাই না। আমি আগরতলার শো করেছি, সোনাই দীঘি নাটক সেবার আমাদের চলছে, তার মধ্যে অন্য নাটক ছিল – পুষ্পচন্দন ছিল, চাঁদ সুলতানা ছিল, অগ্নিপরীক্ষা ছিল। সেবারে ১৯দিন আমরা শো করেছি এক প্যান্ডেলে, গিয়ে আবার কয়েকটা জায়গায় শোকরে, আবার ফিরে এসে তিনদিন শো করেছি। একই রকম বিক্রি। সেখানে বিরাট সমস্ত ঝিল-টিল আছে। আমরা নিজেরা শুনেছি, জেলেরা জাল ছুঁড়ে ‘সোনাই’ বলে চিৎকার করে ডুব মারছে। রিক্সার নাম সোনাই, কাপড়ের দোকান সোনাই, শাড়ি বেরিয়ে গেল সোনাই। এক-একটা হিড়িক আসে এইরকম। তো সেই সুযোগটা এখন আমাদের অনেক কমে গেছে। কমে যাওয়ার তার কারণটা হল যে, এখন খরচাটাও বেড়ে গেছে। তারপরে দলের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। আর বিভিন্ন জায়গায় লোকে চায় যে, একই গ্রুপের কেন দেখব আমরা পাঁচটা গ্রুপের পাঁচদিন দেখব। এরকম ধরুন একটা ব্যাপার এসেছে এখন। সেই হিসেবেই, সেই আত্মীয়তাটা গড়ে ওঠার সুযোগ এখন কমে গেছে। তবে যাত্রার থেকে অনেক কাজ করেছে। বহুজায়গায়। যেমন হলদীবাড়ি, দাদা, আপনার মনে আছে কিনা জানিনা, আমি যখন প্রথম যাই, সেখানে ছিল, মানে, দিনের বেলাতেও ভয় লাগত। সেই যে স্কুল বা হাসপাতাল, ছিটে বেড়ার ছিল, বাঘ আঁচড়াত এসে। দেওয়ালে এসে, ওই ছিটে বেড়ার যে দেওয়াল ছিল তাতে বাঘ আঁচড়াত। আর

ওই খড় পেতে দিত মাটিতে, ঐদিকে প্রতি বছরই বন্যা হত। মাটিতে পা দিলে ভিজে জল উঠতো। তার উপরে খড় বিছিয়ে দিত, তার উপরে দর্মা দিত, তার উপরে আমরা বিছানা করে শুতাম। তো সেই যাত্রার টাকা থেকেই পাকা বিল্ডিং হয়েছে। হাসপাতাল হয়েছে। এগুলো হয়েছে, বহুজায়গায় হাসপাতাল হয়েছে, স্কুল হয়েছে। বহু ভালো ভালো কাজ হয়েছে। তবে এগুলো আমরা হয়তো সবসময় সবটা খবর রাখার সুযোগ পাইনা, সেটা দাদা বেশী বলতে পারবেন, কারণ দাদার ডিউটি হচ্ছে এইগুলোর খোঁজ রাখা। আমরা সেটুকুও খবর রাখতে পারিনা। সত্যি কথা! কারণ দাদা অত্যন্ত বেশী ভালোবাসেন। তার কারণটাই হল, আমরা অভিনয় করাটাকে ভালোবাসি। আর দাদা হচ্ছে, অভিনয় করাবো এইটাকে ভালোবাসে। অভিনয় করিয়ে আমি কি পেলাম আমি এদের কাছ থেকে। সেইটা দাদা ভালোবাসে। সেই হিসেবের, সেই যাত্রা করে আমরা এই গ্রামটার কতটা ভালো করতে পেরেছি, কতটুকু মন্দ করতে পেরেছি, সেইটের দাদা খোঁজ রাখেন বেশী। আর আমাদের স্বার্থ হচ্ছে আমি ভালো করছি কিনা এইটা দেখা। আমি ভালো করছি কিনা, আমার প্রোডাকশন ভালো হচ্ছে কিনা, এইটা দেখা। এই দেখায় একটু তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। দাদা চাইছেন সবাইকে একরকম দেখতে, কিন্তু আমাদের একটু স্বার্থপরতা এসে যাচ্ছে। আমি ভালো করছি কিনা, আমার গ্রুপ ভালো করছে কিনা, দাদা তো সেই দৃষ্টিতে দেখছে না। দাদা দেখছে সবাই ভালো করছে কিনা। টোটাল যাত্রা থেকে কি হচ্ছে দাদা এইটা দেখছেন, দাদা বেশী ভালো বলতে পারবেন।

শ্রোতা

আচ্ছা, আপনারা যে একজায়গা থেকে আর এক জায়গায় যান এবং খুব কম সময়ের মধ্যে এবং এই যে নানারকম পরিবেশের কথা বললেন, অসুস্থ হয়ে পড়েন তো মাঝে মাঝে।

জ্যোৎস্না দত্ত

হ্যাঁ, অসুস্থ হয়ে পড়ি।

শ্রোতা

কোনো একটা অভিজ্ঞতার কথা বলুন, যেটাতে আপনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং আপনাকে ছাড়া শো হবে না সেখানে কিভাবে নাটক চললো---

জ্যোৎস্না দত্ত

এই কয়েক দিন আগে, এই কয়েক বছর আগে—হ্যাঁ, 'নটী লক্ষহীরা'র বছরে তো হলই। আর একটার কথা আমি বলছি। সেবার আমার প্রথম, লো-প্রেসার ধরা পড়ল সেই বারেই। হঠাৎ আমি, শো করে এসে শুয়ে আছি, রাত্রি তিনটের সময় মনে হল যে আমি বোধহয় পড়ে যাচ্ছি খাট থেকে। এরকম একটা মনে হতেই, কিছুতেই আর ঠিক হতে পারছিনা, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, ভোরবেলায় ডাক্তার-টাক্তার ডাকা হোল। চাঁদপাড়ার ঐ দিকে, না, না, নৈহাটিতে শো ছিল। তখন মালিক বা পরিচালক যিনি ছিলেন, দীনেশবাবু, বদ্যিনাথবাবু, তাঁরা বললেন, না, শো বন্ধ। কিন্তু তখন আমাদের স্টাফ চলে গেছে এখান থেকে। 'মেঘে ঢাকা তারা' নাটক হবে। তখন আমি বললাম, একটু কথা বলার ক্ষমতা হয়েছে, আমাকে যেতেই হবে। তার কারণ আমার মেয়েরা তো চলে গেছে ওখানে, বাক্স চলে গেছে, একটা জায়গায় যদি গণ্ডগোল হয়, পরপর পরপর সব চেনগুলো গণ্ডগোল হয়ে যাবে একদম। সেইহেতু আমাকে যেতেই হবে। আমি একবার যাবো, যদি অভিনয় করতে নাও পারি, তবু সেখানে কমিটির লোকের সামনে বা যাঁরা টিকিট কেটে ঢুকেছেন তাদের সামনে গিয়ে আমি যদি দাঁড়াই, তাহলে হয়তো তারা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন যে ঠিক আছে আপনাকে অভিনয় করতে হবে না পরে একটা তারিখ দেখে শো করা যাবে। কিন্তু আমি যখন গিয়ে পৌঁছোলাম, পৌঁছোতেও লেট হয়েছিল, কিছু লোক চলে গিয়েছিল। তারপরে অবশ্য অভিনয় করতে হয়েছে। অসুবিধে হয়। একবার গুরুদাসবাবু[xiv] কি করলেন, ডবল শো হচ্ছে, একটা শো-য়েতে

উনি গান-টান ছিল, করলেন-টরলেন, তারপরে আর একটা শো-য়েতে, একখানা গান গেয়ে উনি বললেন, আমি আর করবোনা, অন্য লোক করে দিক। ব্যাস্‌, খানিকটা চলার পরেই গণ্ডগোল প্রচন্ড। আবার তাকে সেই উঠে মেক-আপ-টেক-আপ করে আবার নামতে হোল। এগুলো হচ্ছে পাবলিকের ভালোবাসা। এগুলো যে নিন্দা করি তা নয়। প্রচুর শরীর খারাপ নিয়েও আমাদের কাজ করতে হয়। উপায় থাকে না কোন।

শ্রোতা

অন্য এ্যাক্ট্রেস থাকেন যারা আপনাদের রোলটা করতে পারেন -----

জ্যোৎস্না দত্ত

হ্যাঁ, দিলেও সেটা পাবলিক মানবে না। আমরা জ্যোৎস্নাদির কাজ দেখতে এসেছি।

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

বাপ মারা গেছে, শ্মশানে, ছ'টার সময় গাড়ি রওনা হচ্ছে, তখনও গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখন মা, সে নিয়ে চলে গেল। বলল, ঠিক আছে, তোমরা পোড়াও না। তুমি চলো না। সে—ওখানে না গেলে এখন প্যান্ডেল পুড়বে, প্যান্ডেল পোড়া মানে তো একটা সাংঘাতিক— এস্টেটটাতো নষ্ট হয়---

জ্যোৎস্না দত্ত

তবে শিল্পীদের প্রচন্ড দায়িত্ব থাকে তার কারণ হচ্ছে, একটা প্যান্ডেলে মনে করুন, তিরিশ হাজার – চল্লিশ হাজার লোক আছে। তার মধ্যে বহু মহিলা আছে, শিশু আছে, যদি কোন একটা কারণে গণ্ডগোল হয়, হয়তো আমার বাবা কি আমার মা একা -তারা মারা গেছেন, কিংবা তারা অসুস্থ হয়েছেন, একা একটা মানুষ, কিন্তু সেই প্যান্ডেলে যদি কোনো গণ্ডগোল হয় তাহলে হয়তো বিশ-পঁচিশজন মহিলা, বিশ-পঁচিশ জন পুরুষ মারা যাবেন। কাজে-কাজেই সেই দিকের প্রাধান্যটা আমাদের একটু দিতেই হয়। আমরা যখন বেরিয়ে পড়ি তখন আর আমাদের আমিত্ব বলে কিছু রাখা চলে না।

প্রতিভা অগ্রবাল

আচ্ছা, অসিতবাবু, আপনি তো অনেকদিন ধরে আছেন, যাত্রার লাইনেথেকে গেলেন – আপনার কি অভিজ্ঞতা, কি মনে করেন, কি ডিফারেন্সটা মনে হোল, কি লাগে ----

অসিত বসু

মোটামুটি যাত্রার ব্যাপার নিয়ে আমি আর কি বলবো, সবই তো প্রায় প্রবোধদা জ্যোৎস্নাদির কাছে শুনেছেন, ওঁরা যতটা বলার যোগ্যতা রাখেন, আমার সেই যোগ্যতাটা নেই। কারণ, ঠিক ঐ অর্থে আমি অতটা যাত্রার লোক - এই ক'বছরে নিশ্চয়ই হওয়া যায় না।

জ্যোৎস্না দত্ত

না, তবুও যাত্রা সম্বন্ধে অসিতদা আমি কিন্তু কিছু বলিনি। আমি কিন্তু স্বার্থপরের মতো আমার গল্প শুনিয়েছি। আপনি কিছু বলুন, যতটুকু জেনেছেন।

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

আপনি একটা জগৎ থেকে আর একটা জগতে ঢুকেছেন---

প্রতিভা অগ্রবাল

কেন গেলেন, গিয়ে কিরকম লাগলো, আছেন, ওখানে থাকবেন না আবার থিয়েটারে ফিরে আসবার বাসনা আছে, দুটোই করছেন না এখন শুধু যাত্রার লোকই হয়ে গেছেন – বলুন।

অসিত বসু

প্রথম যাত্রা দেখার অভিজ্ঞতা বলতে একেবারে সেই ছোটবেলায়, আমরা থাকতাম যে বাড়িতে সেই পাড়াতে শেতলাপূজা ইত্যাদিতে সব যাত্রা-টাত্রা হোত, জানলা থেকে দেখতাম। তখন বাবা বেঁচে। আমরা ছোটরা, নীচে যাত্রার আসরে যাই, খুব একটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু দেখতে খুব ভালো লাগে এবং সমস্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী মানসিকতায়, সে কলকাতা শহরেরই হোক কি গ্রামেরই হোক – যাই হোক, কোথায় যেন একটা, একটা রাংতার মুকুট মাথায় একচিলতে এঁটে, হাতে একটা পাটকাঠি নিয়ে – হারে-রে-রে-রে করে তরোয়াল বা তীরধনুক করে যাত্রা করা, এ বোধহয় আমাদের সব ঘরেই এটার চল আছে।

কাজেই, সেই ক্ষেত্রে যাত্রাটা কোথাও আমাদের মনের মধ্যে বসে আছে – যাত্রা হিসাবে না থাকলেও এবং তার আকর্ষণটা একটা অন্যরকম। ঐ যে জরি-রাংতা-রং এইসমস্ত মিলিয়ে। তারপরে বেশ মোটামুটি জ্ঞানগম্যি হচ্ছে, বয়স হচ্ছে, এইসময় যাত্রাতে যুক্ত হলাম। উৎপলদা প্রথম যাত্রা রাইফেল [xv] যখন করতে গেলেন, রাইফেল, জালিয়ানওয়ালা বাগ, সমুদ্রশাসন, দিল্লী চলো – এই পর্যন্ত আমি উৎপলদার সঙ্গে চীফ এ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টার হিসেবে কাজ করেছি। এই যাত্রাকে খুব সচেতনভাবে বুদ্ধি নিয়ে ব্যাখ্যা বিবেচনা করার সময়টা, সুযোগটা সেই সময় থেকে এসেছে। 'রাইফেল' যাত্রাতে কাজ করতে গিয়ে একজন অসামান্য অভিনেতা, মানে আমার অভিনয় জীবনে বা আমার জীবনে দেখা, শুধু যাত্রা নয়, মঞ্চ, চলচ্চিত্র সব মিলিয়েও, আমার কাছে একটা অদ্ভূত স্মৃতি হয়ে আছে, স্বর্গীয় পঞ্চু সেন [xvi] মশায়। জ্যোৎস্নাদিরও গুরু একরকম। বাবা বলতেন। পরে যখন এগুলো অ্যানালিসিস করেছি, বুঝেছি। আর একজন আমাকে খুব ভালোবাসতেন, ছোট ফণীবাবু [xvii] মশায়। ওঁর কাছে পুরনো যাত্রার অনেক কথা শুনেছি। সেই আগের দিনে, ওনারও আগে আর কি, সেই চারদিকে কলার থোড়, মাচায় পুঁতে দিয়ে তাতে একটা খোল করে দিয়ে, তাতে ঐ ফুয়েল দিয়ে আলো জ্বলছে, সন্ধেবেলায় যাত্রা শুরু হোল,পরদিন সূর্য উঠে গেছে, তখনো যাত্রা হচ্ছে। এইটা ছিল যাত্রা। ন'ঘন্টা, দশ ঘন্টা, এগারো ঘন্টা– চলে গেছে। সেই সব যাত্রাতে থাকতো -নাকি চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটটা গানও থাকতো এবং সেই যাত্রা- সেই ফর্মে জুড়িরা থাকতো, উকিল-মোক্তারের পোষাক পরা সব থাকতো। এ সমস্ত ছিল। মেইনলি সেটা গানের ওপর বেসকরে। যাত্রাগান, সেই যাত্রাগানটাই কিন্তু ট্র্যাডিশনালি চলে এসেছে, বজায় রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। যাত্রা শুনতেই লোকে গেছে। যাত্রাগান। আমরা এখনো বলি, কি জ্যোৎস্নাদি, আজকে গান নেই? মানে আজ আপনার শো নেই? এটা কিন্তু চলে আসছে। তারপরে, যখন যাত্রা করতে আসছি, কলকাতার হ্যামলেট ১৯৭৩-এ হয়েছে, বেশ হোল। তারপরে এমার্জেন্সি-টেমার্জেন্সি হল। তারপরে আর কিছুই নাটক করতে পারি না। আসলে বয়সও তো বেড়ে যাচ্ছে। থিয়েটার করে, গ্রুপ থিয়েটার মুভমেন্ট অনেকদিন করা হোল, ভীষণভাবে জড়িয়ে অনেক কিছু ছেড়ে, চাকরিবাকরি ছেড়ে করা হোল। কিন্তু মুভমেন্টটা ওপেনলি বলি, হতাশা ছাড়া খুব একটা বেশী কিছু দিতে পারেনি।

যদিও সেটা আমাকে অনেক অন্য খোরাক দিয়েছে। আমাকে মানুষ করা - আমার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অংশ। থিয়েটারে অনেক লোকেরা আমাদের বলেন, অশিক্ষিত এবং থিয়েটারে ব্যর্থ। তাই যাত্রা করতে গেছেন। তো সেটা কারণ নয়। থিয়েটারে অনেকের চেয়ে খুব একটা ব্যর্থ হইনি। আর শিক্ষার কথাটা –অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন আমার অত নেই। তবে এক ধরণের – থিয়েটারের জন্য, অভিনয়ের জন্য, নাটকের জন্য, লেখাপড়া বা চর্চার দিক থেকে এবং অন্যরকম ট্রেনিং-এর দিক থেকে, যেরকম ট্রেনিং-এ আমরা মানুষ হয়েছি, তাপসদা খানিকটা জানেন, এখনকার অনেক থিয়েটার ওয়ার্কারেরই সেগুলো নেই বলেই আমার বদ্ধমূল ধারণা।

জ্যোৎস্না দত্ত

আমি একটা প্রশ্ন করছি আপনাকে। যারা আপনাকে বলেছেন যে থিয়েটারে ব্যর্থ হয়েছে বলেই যাত্রায় এসেছে বা গেছে, তাহলে আমি কি বলবো যে মহেন্দ্র গুপ্ত [xviii] ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে এসেছিলেন?

অসিত বসু

না, ওই থিয়েটারের কথাটা এখানে আসছে না।

জ্যোৎস্না দত্ত

বা অজিতেশবাবু? তাই কি? অজিতেশবাবু তো গ্রুপ থিয়েটার থেকে এসেছেন-

অসিত বসু

না, অজিতেশ তার পরে এসেছেন। এসব কথাগুলোর পরে।

জ্যোৎস্না দত্ত

এই কথাগুলো, এইগুলো বলা মানে কি, মানুষের মনে আঘাত দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে কিন্তু আমাদের পক্ষেই সুবিধে হচ্ছে অসিতদা। আপনি দুঃখ পাবেন না। কারণ সুবিধে হচ্ছে এই জন্যেই, তিনি যে আপনাকে আঘাতটা করলেন, তার পরিবর্তে আপনি কিন্তু আরো সচেতন হয়ে যাচ্ছেন যে আমি ভালো করতে পারি কিনা দেখাবো।

অসিত বসু

না, আমার প্রশ্নটা সেখানে না। এটার বক্তব্য উদ্দেশ্য এই যে, এখনো কিন্তু যাত্রা ব্যপারটাকে তারা খুব হীনার্থে দেখে। যাত্রা করতে গেছে!!

জ্যোৎস্না দত্ত

আমি সেই জন্যেই কথাটা বললাম।

অসিত বসু

কিন্তু আমি যদি একটা ফোর্থ-রেটেড, রেট-লেশ, ওয়ার্থলেশ হিন্দি বায়োস্কোপ করতে দুবার বোম্বেতে গিয়ে সাকসেসফুলি করতাম, তখন কিন্তু তারা সমান দরে আমায় মাথায় তুলে নাচতেন এবং এখানে তখন আমার নাম ছাপলেই হাউসফুল হবে। তারাই তখন আমার কাছে ছুটে আসতেন তাঁদের নানা প্রয়োজনে। এখনো অবশ্য আসেন। ওপেনলি আসেন না, অন্যভাবে আসেন, নানা দরকারে। কাজেই আমি যদি ফোর্থ-গ্রেডের হান্টারওয়ালিমার্কা সিনেমা করি, তাতে কিন্তু আমি জাতের লোক আছি। কিন্তু আমি যদি যাত্রা করতে যাই তখন কিন্তু আমি ফাৎরা লোক হয়ে গেলাম, এইটাই হচ্ছে মানসিকতা।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

এর সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার আছে, যদি লক্ষ্য করে থাকো, যে, যে লোকেরা এগুলো বলে এরা সুযোগ পেলে আবার দু'বছর-তিন বছর পরে এরাও কিন্তু যাত্রাতে আসে।

অসিত বসু

হ্যাঁ, যাত্রাতে আসে এবং আসার জন্য ঘোরাফেরাও যেখানে করবার সেখানে করে।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেসিক্যালি বোধহয় ব্যাপারটা যেখানে থাকে – ঈর্ষা বা হিংসাটা তাদের আছে, যে গ্রুপ থিয়েটারে আমাদের দর্শক বাড়ছেনা। তাদের একটা হিংসে থাকে যখন যাত্রাতে পৌঁছে যায় কেউ, তার মানে এতবড় একটা দর্শকসমাজ সে ইমিডিয়েটলি পায়।সেখানে যেতে কিন্তু আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের অন্যদের একটু ভয়ও করে যেখানে জ্যোৎস্না দত্ত এত বছর ধরে প্রায় সম্রাজ্ঞীর মত শাসন করতে পারেন, এতবড় অডিয়েন্সকে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে গ্রুপ থিয়েটারের একজন অভিনেতার ভয় করে। এই ভয়টা থেকেই কিন্তু এই আক্রমণটা আসে।

অসিত বসু

জ্যোৎস্না দত্ত, She is still ruling। এদেশের থিয়েটার এরকম একজন অভিনেত্রী, এতদিনেও কর্মক্ষম অভিনেত্রী উপহার দেবার ক্ষমতা রাখেনি। যে কারণে একটা হীন - এই বোধটা, এইটার থেকেই হয়তো আসে। কিন্তু অবশ্য নিশ্চয়ই আমি বলছিনা, যাত্রা মানেই সবকিছু তার ভালো। কারণ, এই কালচারটা, এই মিডিয়ামটাই তৈরি হয়েছে ফিউডাল সিস্টেমের কোলে বসে। এখন এই জগতে এসে, আজ ৮০-র দশকে এসেও এখনো সেই জিনিসটা থাকলেই যে সেটা চলবে এটা বলে আমি মনে করি না এবং সেটা হওয়া মানে মরে যাওয়া। কাজেই তার মধ্যে সেই ফিউডাল রেমিনিসেন্স রয়ে গেছে। তার চালচলনে যাত্রার, তার ব্যবহারিক দিক থেকে, কিছু নামের ক্ষেত্রে। যেমন যাত্রায় যে বাক্সপত্তর-টত্তর, কস্টিউম ইত্যাদি যায় তারা কিন্তু বলে না যে আমাদের এই জিনিস, এটাকে বলে 'এষ্টেট'। এরকম ছোটখাটো অনেক কিছু ব্যাপারেই সেটা আছে। সেটা ডিপ রুটেড। দীর্ঘ কয়েক দশক, প্রায় কয়েক শতকও বলা যায়, যে সিস্টেমটা একটু একটু করে তৈরি হয়েছে, সেটাকে বাইরে থেকে আমরা এসে দড়াম করে ভেঙে দিয়ে পিপল-এর জন্য ভয়ঙ্কর একটা কিছু প্রোগ্রেসিভ করে দিতে পারব এটা যদি আশা করা যায়, এটা খুব অন্যায় হবে এবং যাত্রাওয়ালাকে তারা হীন বলছেন কেন, এই হীনমন্যতাটা কোথা থেকে, যাত্রাকে হীনমন্য ভাবাবার রুট-টা কোথায়। যাত্রা দেখতেন- অরিজিন্যালি যাত্রার দর্শক ছিলেন কারা? মুচি-হাড়ি-ডোম এরাই যাত্রাকে একসময় বাঁচিয়ে রেখেছেন – ব্রাত্য মানুষেরা। গাঁয়ের জমিদারবাবু তাঁর নাটমন্দিরে ডেকে পাঠালেন, সেখানেও হয়তো তাদের, তারা হয়তো সেই নাটমন্দিরের বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে। তাদের জায়গায় এসে তাদের শেতলাপুজোয় কি মনসাপুজোয় হয়তো গান করতে গেছে যাত্রাদল। কাজেই এইটাই ছিল সেই দর্শকটা।

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকেরাও, জমিদারেও তো দেখতো?

জ্যোৎস্না দত্ত

সেই কথাটাই বলছি। তখনকার দিনে, অবশ্য শোনা কথা, যে বহু পন্ডিত ব্যক্তিরা কিন্তু যাত্রা দেখতেন-শুনতেন। তাই নিয়ে সমালোচনা করতেন। শুধু তাই নয়, বড় বড় উপাধি দিয়েছেন, যেমন –সত্যেন ঘোষ কে, ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদকে, যে বিদ্যাবিনোদ উপাধি দিলেন – এগুলো তো পন্ডিতরাই দিয়েছেন। তখন পন্ডিত ব্যক্তিরাও দেখতেন।

অসিত বসু

হ্যাঁ, মতিলাল রায়, অঘোরনাথ বাবু এদের মত পন্ডিত মানুষ তো বহু জায়গাতেই নেই যাদের নিয়ে যাত্রা তৈরি হয়েছে এবং এই যে হীন করার ব্যপারটা মেনলি কলকাতা শহর কেন্দ্র থেকেই হয়েছে। কারণ কলকাতা শহরে যাত্রা হবার জায়গাটা তখন ছিল বাজার। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি পিপলতো এইটাই। আমরা যদি সত্যি যে থিয়েটার মুভমেন্ট করেছি, পিপল-এর জন্যেই করেছি। করেছি বলে গর্ব করছি।ধরুন সেই 'নবান্ন'র সময় থেকে এ পর্যন্ত অনেক কাজ হয়েছে, অনেকরকম কাজ হয়েছে। ভুল ভ্রান্তি-ভালো খারাপ সব মিলিয়ে কাজটা কিন্তু প্রচন্ডভাবে হয়েছে। কিন্তু এখানে এসে আজ সত্যি করে, আমি নিজের মত বলছি, মনে হচ্ছে কোথাও আমরা একটা, যে পিপলের কথা বলি তার নাড়ীর যোগটা পাইনি। তাই যদি হোত, আজকে গ্রুপ থিয়েটারকে মার খেয়ে একটা কোটারি দর্শকের মধ্যে বসে থাকতে হোত না।আজ গ্রুপ থিয়েটার নিজেরাই একটা রোরিং বিজনেস মার্কেট তৈরি করতে পারতেন। এই স্টেল, পেল কমার্শিয়াল থিয়েটারের ট্র্যাডিশনআছে, তার এগেন্সটে দাঁড়িয়ে লড়তে পারতেন, রুখতে পারতেন। কিন্তু সেই পিপলকে তারা কখনো সঙ্গে পাননি। তারা যেটা পেয়েছেন আরবান, সাবার্ব এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার বলবো, একটা মোটামুটি তৈরি চোখ দর্শককে। যেমন অনেকেই গর্ব করে বলেন এই তো দুর্গাপুরে গেলাম, আমার নাটকটা ফেললাম – হৈ হৈ করে দর্শকের কি রি-এ্যাকশন।পিপল, ওয়ার্কিং ক্লাসএটা নিয়ে নিয়েছে। না, দুর্গাপুরের সেই ওয়ার্কিং ক্লাসটা কলকাতারই ওয়ার্কিং ক্লাস। যে ওয়ার্কিং ক্লাস বলে তারা নিজেদের ঝান্ডা ওড়াচ্ছেন, সেটা কিন্তু সেই ওয়ার্কিং ক্লাসে তারা পৌঁছতে পারেন নি। তাহলে বছরের পর বছর তাদের হিট প্রোডাকশান মার্কেটে দাঁড়িয়ে থাকতো। দাঁড়িয়ে নেই, কিন্তু যাত্রা তার সমস্ত ভ্রান্তি, সমস্ত ভুল এবং অনেক বজ্জাতি নিয়েও এটা কিন্তু ডিপ রুটেড হয়ে আছে পিপলে। প্রবোধদা যে সমস্ত তথ্য দিলেন, তার মধ্যে কয়েকটা তথ্য হয়তো আমি একটু ডিফার করি। অর্থের দিক থেকে না, উনি নাম্বার অফ পিপল যেটা বললেন, উনি যেটা দশ কোটি বলছেন – ওটা আমি এ্যাভারেজ একটা আসর পাঁচটা গান হচ্ছে, সেটা যদি করি, সেই দর্শকটাই রিপিটেড হচ্ছে। ওটা কমে আসে। কিন্তু তার ইনটেকটা কিন্তু কমছে না। ইনটেকটা ঐ হিসেবে কারেক্ট আছে। তাহলে যাত্রা এটা করতে সক্ষম হোল কি করে? তা আমি যাত্রা করতে এলাম, প্রথমত first and foremost আমার পেটের জন্য। আমার থিয়েটার আমায় খাওয়ায় নি। যতদিন পেরেছি না খেয়ে লড়েছি। তারপর একটা সময় পারিনি। যাত্রা আমায় পেটের ভাত দেবে এই গ্যারান্টি দিয়েছে এবং আমি যাত্রাতে এসেছি। যাত্রাতে যখন এসেছি, তখন আমি consciously থিয়েটার ওয়ার্কার হিসেবেই যাত্রায় এসেছি। আমি এখনও থিয়েটার ওয়ার্কার হিসেবেই যাত্রায় আছি এবং যাত্রাকে আমি ভালোবাসি। যাত্রাকে আমি দেখি, যাত্রাকে বোঝবার চেষ্টা করি আমার থিয়েটারের দৃষ্টি দিয়ে। যাত্রাতে আমি যখন নাটক লিখি, তাতে ঐ থিয়েটার আর ট্র্যাডিশনাল যাত্রাটাকে আমি বোঝবার চেষ্টা করি। আমি মতিলাল রায়, অঘোরনাথ কাব্যশাস্ত্রী - এদের বহু পুরনো যাত্রার বইও আমি পড়েছি। আমার কাছে স্টকও আছে। তাদের সঙ্গে আমার থিয়েটারটাকে কোথায় মেলাতে পারি এই চেষ্টাটা আমি একরকম ভাবে করি।

প্রতিভা অগ্রবাল

দু'টোতে কি বেসিক ডিফারেন্স আপনি পেলেন যাত্রা আর থিয়েটারের মধ্যে, সেটা নিয়ে কিছু বলুন।

অসিত বসু

আমি চেষ্টা করি কি করে ওই দু'টোকে ব্লেন্ড করা যায়। হয়তো এইটা, এই মিডিয়ামটা নিয়েই আমি আমার লোকের কাছে পৌঁছে যাব। কিন্তু যখন থিয়েটারের জন্য আবার লিখতে বসি, তখন ঐ আমার কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত দর্শক এবং অনেকরকম আমাদের শিক্ষিত ট্যাবুস আরকি মাথায় কাজ করে।যার ফলে ইচ্ছে থাকলেও মাথা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়, না বাবা, তাহলে আমার দর্শকের কাছে আমার ইমেজটা থাকবে না। এই ইমেজ প্রোজেকসন করতেই বড্ড ব্যস্ত থাকি। তো সত্যিকারের সেই ভাবে ভেঙে থিয়েটারটা করতে পারি না। সেইটে যদি করতে পারি, যখন পাবো সেই জোরটা, সেটা কিন্তু খুব ভালো থিয়েটার হবে বলেই আমার বিশ্বাস এবং এখন যাত্রা যেদিকে যাচ্ছে ধরুন, যাত্রায় সেই গান, অত গান আর যাত্রায় থাকছে না। তারপরে ধরুন নাটকের বাঁধুনি এখন অনেক পালটে যাচ্ছে। প্রোডাকশানের মাউন্টিং -এই যেমন তাপসদা যাত্রাতে লাইট করতে এসেছেন, কনিষ্কদা লাইট করছেন, এবং লাইট করার ব্যাপারটা একটু একটু থেকে অনেকদিন ধরে এক্সপেরিমেন্টেড হচ্ছে। আমি একটা যাত্রা করলাম, সে এক অদ্ভূত ডেয়ারিং পাগলা মালিক আছে, চন্দন মিত্র। সে বলল, "আমার সারাজীবনের স্বপ্ন দাদা, আমাকে Helen of Troy –টা যাত্রার আসরে করে দিতে হবে।" আমার কাছে এটা খুব এক্সাইটিং প্রোপোজিশান মনে হল। কারণ সে দুঁদে বিজনেসম্যান। সে এটার ব্যবসায়িক দিকটাও ভেবেছে এবং যাত্রা যেহেতু ব্যবসাটা গ্রামেই বেশী করে তাহলে এরকম একটা মহাকাব্য, ইউরোপীয় মহাকাব্যকে যাত্রার মার্কেটে গ্রামের লোক দেখবে। এটা আমার কাছে খুব একসাইটিং ও খুব চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছিল। তা, Helen of Troy যাত্রা লিখলাম। ঐ যে একটা Epic grandeur, ওয়েস্টার্ণ এপিক– আমি আবার ইংরেজী বায়োস্কোপ, তারপরে বড় বড় মোটা মোটা বই পড়ে পড়ে অনেক রকম সব ভাবছি – ওই grandeur টা ধরবো কি করে? ভিসুয়াল পয়েন্ট থেকে ধরবো কি করে? এই করতে গিয়ে তখন লাইটের প্রশ্ন এল। লাইট একটা অন্যভাবে ভাবা যায়। সেখানে অনেক রকম লাইটের ব্যবহার করা হোল এবং লাইট কালারেও। আমি তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম বেশ কালারফুল ব্যাপারটা হবে। সমস্ত পরিবেশটা সব সময় একটা অন্য লেভেলে থাকবে। তার বেস কালারটা একটা হাল্কা পিঙ্ক রেখে দিয়ে তার ব্যাকগ্রাউন্ডে সব হবে। তাতে ঐ চটের মোটা বা raw চটের কস্টিউম তাতে সলিড মেটাল জিনিস দিয়ে অদ্ভূত একটা এফেক্ট পাওয়া যায়। তা সেই কালার-টালার শুনেই চন্দন হঠাৎ এ্যাডভার্টাইসমেন্ট করে দিলেন তার যাত্রা ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত যাত্রা। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট যাত্রা তো হয় না। তো এটা কি করলে– বললেন "না, দাদা, এটা ভীষণ এ্যাট্রাকশান হবে।" বলে সে বিজ্ঞাপন করে দিলে। আর লোকে আমায় গালাগাল দেয়, তাপসদা আমায় গালাগাল দেয়, এটা কি করেছো? বললাম এটা আমার হাতে নেই। এটা মালিকের হাতে। মালিকরা সবসময় সব জায়গাতেই ম- সব সময়েই তার একটা অন্যরকম ব্যাপার হয়। তাই মালিকদের সম্পর্কে একটু ইয়ে আমার আছেই। বললেন এটা থাকবেই কিচ্ছু করার নেই, এটা বলা যায় না। তা করলাম। সেইসময় যাত্রায় যারা রথী-মহারথীরা আছেন, অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, পরিচালক, নাট্যকার তারা কিন্তু তুমুল বিক্ষোভ শুরু করলেন। যাত্রার মহত্ত্ব, যাত্রার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ঐতিহ্য ইত্যাদি এবং প্রবোধদাকে খুব খোঁচাতে লাগলেন। উনি কমন ম্যান। প্রবোধদা তখন আমাকে বললেন, আপনি এইটাকে ডিফেন্ড করে আর্টিকল লিখুন। তখন সেটা লেখা হল আনন্দবাজারে এবং সবচেয়ে মজা এইটা, আমার সবচেয়ে গর্ব, তারপরের বার থেকে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড দলে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করবার জন্য অন্তত চারটে করে লোকের রুজি বাঁধা করে দিয়েছি। এইটা আমার কৃতিত্ব। এইটা আমি করতে পেরেছি। এটা করতে পেরেছি এবং এটা করব না কেন? ভাবুন, আগে যখন যাত্রা ছিল, জ্যোৎস্নাদির কাছে শুনেছেন, খুব বড় গ্যাদারিং হলে, দু'হাজার, আসরটা থাকতো মাঝখানে-

জ্যোৎস্না দত্ত

হ্যাঁ, তাইতো। একটা জমিদারবাড়ির নাটমন্দিরে যাত্রা হচ্ছে, সেখানে ক'হাজার লোক থাকতে পারে?

অসিত বসু
মাঝখানে আসরটা চারদিকে লোক, অনেকে নানা গল্প করছে----

প্রবোধবন্ধু অধিকারী
এই একটু ইয়ে করছি। জমিদারবাড়িতে যাত্রা হচ্ছে, মানে আমাদের বাড়িতে। আমার জ্যাঠামশায় হুঁকো নিয়ে বসতেন, তাকিয়া-টাকিয়া পাতা থাকতো– দর্শকরা তো যাত্রা হচ্ছে দেখবে, মাঝে মাঝে তাকে দেখছে কিনা! কে তাকে দেখেনি – নায়েবকে বলল নামটা লিখে রাখতো -দেখেনি। তারপরদিন খাজনার তাগাদা গেল, তারপরদিন বেঁধে নিয়ে এল। যাত্রাও দেখতে হবে, আমাকেও দেখতে হবে। আমি যাত্রা করাচ্ছি না! এইসব ব্যাপার ছিল তখন।

অসিত বসু
কাজেই তার দর্শকের রেঞ্জ ধরুন আসর থেকে ধরুন কতটা হতে পারে? বিশ ফুট, তিরিশ ফুট এই সার্কেলে চলুক - এর চেয়ে বেশী হতে পারে না। এইটাই বলতে আসছিলাম। কী রকম গল্প শুনুন, শুনতে হয়ত খারাপ লাগবে, কিন্তু আমার যাত্রার কানে আর খারাপ লাগে না। বলল – অমুকবাবু, সে যে একটা হুঙ্কার দিলেন, পাশে একটা কুকুর ছিল, সেটা প্রেগন্যান্ট কুকুর ছিল, হঠাৎ তার বাচ্চা হয়ে গেল ঐ হুঙ্কার শুনে। এইরকম ধরনের গালগল্প। বুক কেঁপে উঠল। অসম্ভব! কোন হিউম্যান ভয়েসে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু যাত্রা যখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড হল, যখন এটা নিয়ে একটা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজ শুরু হোল, টিকিট বেচে যাত্রা শুরু হোল, মিঠানি গ্রাম থেকে, মিঠানি কোলিয়ারী থেকে বোধহয় –

প্রবোধবন্ধু অধিকারী
না, এটা হয়েছিল খুলনা ডিস্ট্রিক্টে প্রথম –

অসিত বসু
না, ওয়েস্ট বেঙ্গলে বলছি, ওয়েস্ট বেঙ্গলে মিঠানি থেকেই শুরু হয় বোধহয়। হ্যাঁ, কিন্তু তারপরে যাত্রাটা আর ঐ ভাবে ছড়িয়ে রইল না। এক জায়গায়। এখন মোটামুটি এ্যাভারেজএকটা standard দল খুব খারাপ হলেও সাড়ে চার থেকে পাঁচহাজার দর্শক পাবেই। দশ-পনেরো এ্যাভারেজ স্ট্যান্ডার্ড -

প্রবোধবন্ধু অধিকারী
মেদিনীপুরের দল হলেও?

অসিত বসু
হ্যাঁ। সেই দর্শক যদি হয়, সে কোন জায়গাটা জুড়ে থাকবে ভাবুন এবং তার আসর যদি মাঝখানে করতে হয়, সাজঘর থেকে আর্টিস্টরা যাবে আসবে, তাতে যে পরিমান এক্সহস্টেড হয়ে যাবে, আর অভিনয় করা সম্ভব নয়। কাজেই, খুব স্বাভাবিক কারণেই আজ আসর একপাশে সরে আসছে। প্রায় স্টেজের মত হয়ে আসছে। এটা আমাদের পক্ষে খুব লাভজনক। একপাশে সরে আসছে এবং এত দর্শক শুনবে কি করে? কোনো হিউম্যান ভয়েসে শোনাতে পারবে না। মাইক্রোফোনের দরকার হচ্ছে। আজ ধরুন, হিন্দি সিনেমা, কালার ফিল্ম, টিভিও রেঞ্জের মধ্যে, যে যেখানে আছে, গ্রামে –গ্রামে কমিউনিটি করে তারা টিভি দেখছে –এইসব মিডিয়াগুলোর সাথে তারা পরিচিত হচ্ছে। এই হিন্দি ফিল্ম খারাপ ভালো সব মিলিয়ে যাই হোক না কেন, এক ধরণের প্রচন্ড স্পিড তাতে মেনটেন করে। এই যে প্রবোধদা যেটা বললেন, যে এখন লোকের কাছে যেটা ডিমান্ড, খানিকটা স্পিড নিয়ে আসি, খানিকটা উত্তেজনা নিয়ে আসি, সেই উত্তেজনাটা নানা রূপের হতে পারে, শুধুমাত্র যে মারপিটের উত্তেজনা, খেলার উত্তেজনা তা না । কাজেই এই স্পিডের সঙ্গে কম্পিট করতে হবে। যাত্রার যেটা শোনা ছিল, যাত্রাগান শুনতে যাওয়া, এখন আর শুনতে যাওয়া হলেও হবেনা। চোখ তৈরি হয়ে গেছে মানুষের, তাকে খানিকটা

দেখাতে হবে। এইখানে এসে অন্তত আমি যেটা সবচেয়ে বিশ্বাস করি, আমার নাটক খুব স্টিফ হয় যাত্রায়। মানে ঠিক যাত্রার নাটক হয় না। এইবারে হয়তো একটা যাত্রার নাটক লিখতে পেরেছি –'আজব রাজার দেশে'। তা আগের নাটকগুলো খুব স্টিফ নাটক, তার সাবজেক্টগুলোও খুব স্টিফ ছিল।

<u>প্রতিভা অগ্রবাল</u>

চলল কী রকম? কমার্শিয়ালি কিছু চলেছে?

<u>অসিত বসু</u>

কমার্শিয়ালি ছ'লাখ টাকা প্রফিট দিয়েছে। আলাদীন প্রফিট দিয়েছিল সাড়ে তিনলাখ টাকা। ছ'লাখ টাকা প্রফিটদিয়েছে Helen of Troy।

<u>প্রতিভা অগ্রবাল</u>

ফিগারগুলো ঠিক বলছেন অসিতবাবু?

<u>অসিত বসু</u>

অন্তত মালিক চন্দন আমায় তথ্য দিয়েছেন। ঘোড়দৌড়ের প্রচন্ড নেশা তার। এত লাভ সত্ত্বেও তার দলের অধোগতির কারণ তার লাভের টাকা সে সবটাই আবার রেসখেলে উড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই, ডিরেকটর হিসেবে আমার কিন্তু যাত্রাজগতে একটা প্রচন্ড সুনাম আছে। যে ওর কম্পোজিসানগুলো দারুণ হয়। তার মানে কিচ্ছু না, আমরা থিয়েটার থেকে যে ভিসুয়াল বা ওপেন এয়ার থিয়েটার থেকে, ফিজিক্যাল থিয়েটারের - ফিজিক্যাল এ্যাক্টিং-এর যে ব্যাপারটা - সেটাকে আমরা যাত্রার আসরে সাজিয়ে তুলছি। সেইটে দেখতে যাত্রার যে মনোটোনি, এক প্লেনের নড়াচড়া, এইটা দর্শকদের চোখে ভেঙে গিয়ে অন্যরকম লাগছে। ভালো লাগছে। এইটা কিন্তু আমরা একটা জিনিস দিতে পারছি। এটা কিন্তু আমাদের একটা দেয়ার – যাত্রাতে এবং যাত্রা থেকে যেটা নিতে পারছি, সেটা হচ্ছে যাত্রার ট্রিমেন্ডাস স্পিড এন্ড ইলাস্টিসিটি । যেটা আমাদের স্টেজের নেই। ফিল্মের আছে। কিন্তু ফিল্ম ক্যানভাস তো স্টেজ নয়। ধরুন যাত্রায় একটা সিন শেষ হচ্ছে কিরকম স্পিডে, এই সিনটা শেষ হতে রাজপ্রাসাদের একটা সিন হল –"তাই যদি হয় তোমাকে হত্যা করব"– বলে বেরিয়ে চলে গেল। তারপরেই জঙ্গলের একটা সিনে ঢুকছে, মাঝখানে তো কোন ব্রেক নেই। "হত্যা? হ্যাঁ, একে হত্যা করা হবে জঙ্গলে নিয়ে এসে"– এই যে ডায়ালগ -মন্তাজ বলা যেতে পারে, ডায়ালগ টু ডায়ালগে টেনে নিয়ে এবং এই স্পেসের ব্যাপারটা। আমি বিদেশ-টিদেশ খুব যাইনি, শুনেছি-টুনেছি। ছবি দেখেছি, ইত্যাদি। কিন্তু এদেশের মাটিতে বসে আমার মনে হয়েছে বা ক্রমশ মনে হয় আমাদের দেশের, oriental soil লোকেদের ইমাজিনেশনের জায়গাটা বোধহয় একটু বেশী। অন্যদিক থেকে ইমাজিনেশনের কথা বলছি। আমাদের কতকগুলো সেট ইমেজেস আছে। একেবারে আমাদের দেশীয় ইমেজ। ধরুন আমি যদি আসরে দাঁড়িয়ে এরকমভাবে দাঁড়াই(কৃষ্ণের বংশীধারী মাইম), কিচ্ছু বলতে হবে না, আপনাদের কারুর বুঝতে অসুবিধে হবে না। এ দেশের কোনো মানুষের। এরকম অনেক মুদ্রা আছে, অনেক ইমেজেস আছে। আমাদের এই ইমেজগুলোখুঁজে বার করতে হবে। যাত্রার পকেটে সে জিনিসগুলো আছে, যেটা থিয়েটার হারিয়েছে। কারণ আমাদের থিয়েটার তৈরিই হয়েছে ব্রিটিশ থিয়েটারের আদলে এবং তারপরে মুভ করতে করতে একটা স্টেজে কিছু মৌলিক কাজ হতে হতে তারপরে হঠাৎ বিদেশী থিয়েটারের চর্চার জোয়ারে পড়ে গিয়ে আমরা বিদেশী থিয়েটারটা চাক্ষুষ না দেখে শুধু hear-say evidence-এর ওপর ভরসা করে,আর কিছু প্রোডাকশান পিকচারস দেখে তার উপর এত ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছি, যে, আমরা সেইগুলো এখানে জোর করে দিতে চাইছি। যার ফলে অনেক কিছু আমাদের এখানে নিচ্ছে না। রিজেক্টেড হচ্ছে থিয়েটার। সত্যি যদি থিয়েটার রিজেক্টেড না হত, তাহলে আমাদের নিশ্চয়ই খাওয়াতে পারত। একটা লোকের ভাত দিতে পারছে না! পারছে না। কেন পারছে না এটা কিন্তু খুব সিরিয়াসলি বা যারা গালাগাল দেন, যাঁরা এই সমস্ত রি-

এ্যাকশনারি-টি-এ্যাকশনারি বলেন,তাঁদের কিন্তু নিজেদের ভবিষ্যতটা বাঁচাবার জন্যে এটা খুব ভাববার দরকার আছে। কোন পথে যাচ্ছে এবং কোন পথে যাবে এই থিয়েটার। আমার কিন্তু মনে হয় এদেশে যাত্রার দিকে তাকালে এবং যাত্রার যে বিজনেস সার্কিটটা আছে। এই ফর্মে এবং ভালো যাত্রা করলে লোকে নেয় না – জ্যোৎস্নাদির সঙ্গেই আমি একটা নাটক করেছি, ‘এ মাটি আমার মাটি’ বলে একটা নাটক, tribal peasantry ওপর যেটা, আট টাকা দশ পয়সা মজুরীর ব্যাপার নিয়ে যে লড়াইটা, একেবারে আধুনিক। আমি যদি এটা থিয়েটারে ফেলি এটা থিয়েটারের নাটক। জ্যোৎস্নাদি অভিনয় করেছেন, গুরুদাসবাবু অভিনয় করেছেন, আমরা অভিনয় করেছি – যেখানে হয়েছে, হয়ে একেবারে জমে গেছে এবং সেটা এ্যাবসোলিউটলি থিয়েটার।সেখানে মুভমেন্টস থিয়েটার, সেখানে গান। আমার দুঃখ থিয়েটারে ইচ্ছে করলেও গান রাখতে পারি না। সেখানে জ্যোৎস্না দত্ত, জ্যোৎস্না দত্ত অবশ্য একটাই আছে, দু’টো নেই, কিন্তু যে কোন আর্টিষ্ট যাত্রার কানের কাছে পড়া সুরটার পরে না, একধরণের গান গেয়ে দেয়। কিন্তু আমরা থিয়েটারে সে গান গাওয়াতে কিছুতেই পারি না। নেই, আর্টিষ্ট নেই। আর ওখানে পেটের দায়ে আর্টিষ্ট এবং ঐ আর্টিষ্টরা কিন্তু সয়েলের সঙ্গে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ। কারণ যাত্রাদলের আর্টিষ্টদের মধ্যে এবং যন্ত্রীগোষ্ঠী কিংবা ম্যানেজার ইত্যাদি বা যারা সাজঘরের কাজ করেন- এই সব ছেলেগুলোর মধ্যে ধরুন শতকরা নব্বই জন হচ্ছে গ্রামের মানুষ। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, চাষী, ক্ষেতমজুর – এরা। অফসিজনটাতে এরা চলে আসেন যাত্রা করতে। আবার চলে যান মাঠের কাজ করতে। সুতরাং তাদের রুট-টা কিন্তু অন্য জায়গায় আছে। কতকগুলো সুর, যেমন যাত্রা করতে করতে অনেক অভিনেতার তার ভেতরে নিয়ে আসার ক্ষমতা অনেক আছে। প্রচন্ড আছে। আমরা যেরকম থিয়েটারের চর্চা করি, সেখানে বহু অভিনেতার তা নেই, বহু কেন, খুঁজলে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ঐ যে একটা মেথডটারমধ্যে দিয়ে গিয়ে পলিশড হওয়া, সে সুযোগটা ঘটেনি। পেটের দায়ে চলে এসেছেন কিংবা নেশার টানে চলে এসেছেন। এসেই হয়তো - আর যাত্রার যেভাবে দল বেড়ে যাচ্ছে এবং আর্টিষ্ট এত কমে যাচ্ছে, যার দাম পাঁচ টাকা হওয়া উচিত নয় মালিকেরা তাকে পঞ্চাশ টাকা –পাঁচশ টাকা দিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। এখন আমরা ঠাট্টা করে বলি, এখন মাংসের দরে যাত্রায় আর্টিষ্ট কেনা হয়। এই ক’কিলো আছে? একটু দর্শনধারী হলেই হয় মোটামুটি। করতে পারুক না পারুক। এই সুযোগটা অনেক পাজী লোকেরা নিচ্ছে কিন্তু। যার ফলে যাত্রার এ্যাক্টিং কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা খুব ভাববার কথা যাত্রার দিক থেকেও। যাত্রায় আর সেই আর্টিষ্ট পাচ্ছি না। হাতে গোনা কয়েকজন রয়েছে। যে মন কেড়ে নিচ্ছে অভিনয় করে – এই অভিনেতা আর পাওয়া যায় না। তার কারণটা ঐখানেই। ঐ কিলো দরে আর্টিষ্ট কেনা হচ্ছে বলে। এই ইন্ডাস্ট্রির চেহারা বাড়তে বাড়তে এগুলো হতেই থাকবে এবং কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে না দাঁড়াবে সেটা পরের কথা। আমি যাত্রা করতে এসেছি, যাত্রার থেকে এই জিনিসগুলো দেখবার জন্যে – থিয়েটার থেকে যাত্রাতে – প্রবোধদা একদিন আমায় বলেছিলেন যে, আমি যখন প্রথম যাত্রা করতে এসেছি - আমি থিয়েটারকে যাত্রা দিয়ে মুছে দেব।আমি বললাম আমিও যাত্রাকে থিয়েটার দিয়ে মুছব। আমি কিন্তু খানিকটা মুছেছি। এটা প্রবোধদা এগ্রি করুন আর নাই করুন এবং প্রতিভাদি যেটা জিজ্ঞেস করেছেন – আমি থিয়েটার করব না যাত্রা করব, আল্টিমেটলি কি করব, এটা পরিষ্কার কথা। মানে অর্থনৈতিক কারণে বলি যাত্রা আমি করবোই, যাত্রা আমাকে করতেই হবে, দু’বছর করব না চার বছর কোরবো না ছ’বছর করবো সেটা পরের কথা। আমার শরীর কতটা অ্যালাউ করবে বা মানসিকভাবে কতটা যেতে পারবো সেটা পরের কথা। থিয়েটারটা শেষ মেশ আমি করবই। থিয়েটারটাই আমার জায়গা। সে লোকের ভালো লাগুক চাই না লাগুক। আমি করবই এবং এখনো করছি। যাত্রা যে সময়টায় করিনা, সে সময় এখানে বসে একটা থিয়েটার তৈরি করি এবং আমার ছেলেরা যারা আমার সঙ্গে কাজ করেন তারাও সেইভাবে তৈরি হন।_ যে ভাষায় কথাটা বুঝতে চান, তার সবটাই এ্যাকসেপ্টেবল এটা বলছি না। জনগণ নাম দিলেই যে সব শুদ্ধ হয়ে গেল, লোক সংস্কৃতি, ‘লোক’ শব্দ জুড়লেই

যে সব পবিত্র হয়ে গেল এরকমকোন কথা নেই। তার মধ্যেও অনেক অনেক ডেকাডেন্সি আছে, অনেক কিছু ফেলে দেওয়ার মতো আছে। কিন্তু একটা তার ভাইটালিটি, তার প্রাণশক্তিটা প্রচন্ড এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। এখন সেই জায়গাতে সেই ভাষা দিয়ে থিয়েটারকে সেই চেহারা দিয়ে আমিও খানিকটা ছাড়ি, সেও খানিকটা ছাড়ুক করে আস্তে আস্তে এগোতে পারি কিনা এইটেই হচ্ছে আমার ইচ্ছে এবং লক্ষ্য। সেটা যদি করতে পারি – আমার জীবনের শেষ স্বপ্ন আর কি!

<u>শ্রোতা</u>

আচ্ছা,যাত্রার দর্শক অশিক্ষিত, এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করছি যে, শান্তিগোপাল[xix] তো প্রায় সবই বিদেশী সাবজেক্ট করে এবং দর্শকদের মধ্যে প্রচন্ড- বুঝতে দর্শক পারছেন দর্শকরাও নিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। শান্তিবাবু যদি সাকসেসফুল হয়ে থাকেন –

<u>প্রতিভা অগ্রবাল</u>

আমার মনে হয় আলোচনার আগে আমরা যদি একটু তাপসবাবুর কথা একটু শুনে নিই, কেন প্রবোধবাবু যাত্রাকে দিয়ে থিয়েটার মোছবার কথাটা ভাবলেন আর অসিতবাবু থিয়েটার দিয়ে যাত্রাকে মোছবার কথাটা ভাবছেন – তাপসবাবু নিশ্চয়ই থিয়েটার আর যাত্রা দুটোতেই লাইট করে সমতা বজায় রাখবেন এটা আশা করি। তো তাপসদা বললেন গোড়াতে, আমি কনিষ্ঠতম এ লাইনে, কনিষ্ঠতম হলে নিশ্চয়ই তার এক্সপিরিয়েন্স, অভিজ্ঞতা এখন আরও খুব ডিপ হয়েছে, এই বুড়ো বয়সে কনিষ্ঠতম হয়েছেন, তা একটু উনি ওনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলুন – জ্যোৎস্নাদি চলে যাচ্ছেন, আর একটু যদি থাকতেন, থাকলে হয়তো আরো কিছু হয়তো এই ডিসকাশনে ভাগ নিতে পারতেন – আধঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যেত –তা একটু আপনি গান করে দিন –

<u>প্রবোধবন্ধু অধিকারী</u>

ধরবে ধরবে – যাত্রার গান –

<u>জ্যোৎস্না দত্ত</u>

এ জীবন শুধু ভার –তাহারে যদি না পেলাম, জীবনের তবে মূল্য কি আর –এ জীবন শুধু ভার।

<u>তাপস সেন</u>

আমার আর কি বলার থাকতে পারে। কনিষ্ঠতম না, আমি তো একেবারে যাত্রার মধ্যে সবে ঢুকলাম এবং আমি এদের মত – কারুর মত –মানে যাত্রা সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। আমি ছোটবেলায়ও কোনদিন দেখিনি, প্রবোধবাবু যে সেই নৌকো আসার গল্প বললেন, এবং জ্যাঠামশায়ের গল্প বললেন বা অসিত যেটা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখেছে – আমি যাত্রা জিনিসটা দেখিইনি কোনোদিন। রবীন্দ্রনাথ থেকে নানান লোকের লেখায় পড়েছি। কিন্তু যাত্রা সম্পর্কে আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না। এই অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত এবং এখনো হয়ত আছে, একরকম করে যাত্রার প্রতি আমার কোনো অশ্রদ্ধা, বিতৃষ্ণা এবং বিরূপ মনোভাব ছিল।

আর তারপর – তার অনেক কারণের মধ্যে একটা বোধহয়, যখন সেই শোভাবাজার রাজবাড়িতে প্রথম যাত্রা আমি দেখি, সেই সময়ের পর – আরো দু-একটা দেখার পরই, দুটো জিনিস মনে হয়েছে যে, যাত্রা স্টেজে অভিনয় যখন হচ্ছে, সেটা স্টেজের যে একমুখী, ইউনিডিরেকশনাল- একদিকে যে ফ্রন্টাল অভিনয়, সেই ব্যাপারটা মেইনলি হচ্ছে এবং স্টেজের যে লিমিটেশান, তার মধ্যে প্রেজেন্ট করবার প্রবণতার থেকে ওটা একটা কন্ট্যামিনেটেড, একটা যাত্রা - তার আসল বৈচিত্র্য বা তার ক্ষমতা, সেটার থেকে দূরে সরে আসছে, সেই কারণে, আরো – আর বিশেষ করে একজন থিয়েটার ওয়ার্কার হিসেবে দেখতাম এবং সেটা আমি লিখেওছি, প্রবোধবাবুর কাগজেই, যে ঐ ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন খুঁজতে হয়। যাত্রার বিজ্ঞাপনের বন্যায় সিনেমা তো গেলোই, থিয়েটারের লোকেরাও আর বিজ্ঞাপন দিতে পারে না। সব এত বিশাল বিশাল দু-পাতা, চার-পাতা এত বড় বড় - ও থিয়েটার খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই হিসেবে, আমাদের স্বার্থে, আঁতে বা ভ্যানিটিতে, ইগোতে যে কোনো জায়গায় ঘা লেগেছে, লাগত, প্রতি মুহূর্তে। আর যাত্রা তার টেক্সট, তার নাটক, যতটুকু যেটা দেখেছি, তার মধ্যে আমার গন্ডী খুব কম। সেই স্টক খুব কম। তাতে আমার মনে হয়েছিল যে, যাত্রার যে সাহিত্য যেটা, সেটা কিছু ক্রুড। তার মধ্যে কাঁচা ব্যাপার আছে। অন্য পাঁচটা নাটক বা সাহিত্যের থেকে জোড়াতালি দিয়ে নানান রকমভাবে হাজির করা হয়, কিন্তু তার – আমি এই বলছি না আমাদের নাটক বা সাহিত্য তার মধ্যে সব কিছু যে ভাল তা নয়, কিন্তু সেইখানে অপেক্ষাকৃত ব্যাপারটা ক্রুড, লাউড এবং একটা হঠাৎ মনে দাগ কাটানোর জন্য কতকগুলো সস্তা ফর্মূলা, চেষ্টা, মেলোড্রামা, অভিনয় ইত্যাদি, এরকম একটা আলগা ধারণা ছিল, না ভালো করে দেখে, না ভালো করে শুনে এবং সেইটে থিয়েটারে যতটুকু মগ্ন থেকেছি কাজে, তার মধ্যে সেই ধারণাটা নিয়েই, থিয়েটারের সঙ্গে যারা যুক্ত, সেই লোকেদের সকলের সঙ্গে আমিও মনে করেছি যে, এটা একটা অপরিণত, অনেক প্রাচীন হতে পারে, অনেক তার ঐতিহ্য থাকতে পারে এবং কোথায় গ্রামে –গঞ্জে, খালে-বিলে, আমার বাড়িও পূর্ববাংলায়, সেই বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে কিভাবে হতো, কোনো ধারণাই নেই ঐ সাহিত্য-শিল্পের লোকের কাছে গল্প যেটুকু শুনেছি। কিন্তু যেটা দেখেছি অল্পস্বল্প আভাষে, দু-একটা আসরে, স্টেজে, এবং সে উৎপল দত্তের রাইফেলই বলুন, জালিয়ানওয়ালা বাগই [xx] বলুন, হেলেন অফ ট্রয়ই বলুন, সবটাতেই আঁৎকে উঠেছি, উরে বাপরে! এ একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার! বীভৎস! এটা যাত্রাও না, থিয়েটারও না, থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা না যাত্রাটিক্যাল থিয়েটার কি বলা যায় জানি না। প্রবোধবন্ধুবাবু সেটাকে ভয়ানকভাবে তুলে ধরেছেন। এইটেই আমি মনে করে এসেছি, আসতাম। আজকে প্রবোধবাবু যে স্ট্যাটিস্টিকস দিলেন ইন্ডাস্ট্রির, তার মধ্যে, সেটা ডিসপিউটেবল হতে পারে, তার সঙ্গে আমি এইটে অ্যাড করতে চাইছি যে, যাত্রার যে লিমিটেশন, যেখানে এখন লোকসংখ্যা এবং অনেক দূরে দূরে তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য মোটর, বাস, জিপ, ট্রেন, এমনকি এরোপ্লেনেও যাতায়াত করতে হয়। টেলিফোনে যোগাযোগ করতে হয়। যাত্রার বায়নার জন্য প্রত্যেক মালিকের ঘরে ঘরে টেলিফোন আছে এবং টেলিফোনে বুকিং হয়।এই যে সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার তার সঙ্গে এই শোনানোর জন্যে দেখানোর জন্যে অসিত এবং জ্যোৎস্নাদেবী যা বললেন, আলো, শব্দ, এসব এসেছে। কিন্তু সেটাতেও আমি দু'একটা আসরে গিয়ে দেখেছি, বেশি যাইনি, মাইক্রোফোনে, লাউডস্পিকারে অভিনয় করার ফলে, যে কোন গলাই টোটাল একটা

অ্যাভারেজ মেটালিক গলা হয়। কারণ ১০হাজার-১৫ হাজার লোককে শোনানোর জন্য যে হল, যে লাউডস্পিকার দিতে হয়, সেগুলো ভালো দরের লাউডস্পিকার হয় না। সেগুলো হর্ন লাউডস্পীকার হয়। তার ফলে খুব যে গলার যে টেক্সচার এবং রেঞ্জ এবং গান এবং মিউসিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট, যেটা সামনে শুনলে ভালো লাগে, সে সবটাই এক রকম হয়। আমি বহুদুরে দূরে গিয়ে একেবারে পেরিফেরিতে ঘুরে দেখেছি, ব্যাপারটা এই, আর ওই ১০ হাজার, ২০ হাজার, ১৫ হাজার লোক হওয়ার জন্য আলো করলেই হবে না, আলো স্ট্রং করলেই হয় না, একটা দূরত্বের পর সেগুলো ছোট্ট পুতুল হয়ে যায়। ল্যাপাপোঁছা কতকগুলো লোকের ব্রড মুভমেন্ট এবং যাত্রায় যেহেতু তার উত্থানপতন, ইমোশান, সব জিনিসটা একটা তথাকথিত উচ্চগ্রামে বাঁধা, যেটা এক সময়ে একটা সময় পর্যন্ত আমার মনে হয়েছিল যে, বোধহয় সুর, ঝঙ্কার এবং এই যে উন্মাদনা এই ব্যাপারটার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, এমন একটা কিছু ম্যাজিক আছে, আমি কিছু যাত্রার আসরে গিয়ে দেখেছি যে, রাত্তির একটা-দেড়টা পর্যন্ত লোক তিনদিকে, কেন চারদিকে – পেছনদিকেও বসে আছে এবং তারা দশটাকা, পনেরোটাকা টিকিটেও আছে আবার এমনিও আছে। সে লোকগুলো রাত্তির একটায় গেল আর যে যাত্রা, যে সব অভিনয়ের রিহার্সাল হয়েছে এবং মহাজাতি সদনে বা গদিতে বা ষ্টারে, সেইটা লিফটেড হচ্ছে ওই একদিকে। এই যে স্পেসকে সমস্ত এই ২০ফুট বাই ২০ফুট জায়গাতে সমস্ত লোকের দিকে ঘুরে ফিরে, দুটো লোকের সঙ্গে দুটো লোকের সম্পর্কের যে মজা, তিনজন লোক থাকলে আর এক রকম বা অনেক লোক থাকলে আর একরকম, একটা মাঝখানে ছোট্ট মিনি স্টেজ থাকে বা একটা বাক্স থাকে, কেরাসিন কাঠের, সেইটেই সিংহাসন, সেইটেই বিছানা, সেইটেই চেয়ার বা ওই দাঁড়িয়ে এইখানে - এই এক্সিট-এন্ট্রান্সটা আর সমস্তটা নিয়ে যে ভয়ানক মিনিংফুল হতে পারে, এইটে দু-একবার গিয়ে মনে হয়েছে যে আমাদের থিয়েটারের যারা আধুনিক চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত, তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করব, যার কথা উঠেছিল এক্ষুনি, তার নাম হল মহেন্দ্র গুপ্ত। যিনি স্টার থিয়েটারের সঙ্গে বহুদিন ধরে তিরিশের দশকের শেষের দিক থেকে যুক্ত। তাঁর বই আমি প্রথম পড়ি 'মঞ্চে ও নেপথ্যে'। থিয়েটার ক্র্যাফট এবং থিয়েটারের অভিনয় নিয়ে তিনি শেষ চ্যাপ্টারে আক্ষেপ করেছেন যে কবে সেই আধুনিক থিয়েটারের লোক আসবে, কবে সেই আধুনিকতা-মডার্ন হবে তার সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী, কন্সার্ভেটিজম থেকে যাবে। তখনো আজকের দিনের আধুনিকরা আসেননি। তাদের নামও শোনা যায় নি। সেই সময় সে বইটি ছাপা হয়েছে এবং আমি কিনেছি। আর একটি বই ছিল নরেন দেবের 'সিনেমা'। এই দুটো বই ছাড়া কিছু জানতাম না। সেই মহেন্দ্র গুপ্ত থেকে আরম্ভ করে উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, অসিত বসু, অসিত বন্দোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, শ্যামল ঘোষাল, শ্যামল ঘোষ এবং থিয়েটারের অনেক শিল্পী বন্ধু, যাঁরা আমাদের সমসাময়িক, আমরা একসঙ্গে অনেক নাটকে কাজ করেছি, উৎপলের দলে, অন্যান্য দলে, তারা কাজ করেছেন। জ্ঞানেশ মুখার্জি[xxi] । কিন্তু আমি দেখলাম যে এই যে স্পেস, তিনদিক ঘিরে বা চারদিক ঘিরে, তাকে নিয়ে যে সম্পর্কের ব্যাপার, সেইটেকে কোনোভাবে খেলানো বা কোনভাবে ব্যবহার করার কথা উৎপল দত্ত বা উৎপল দত্তের মন্ত্রশিষ্য অসিত বসু বা অজিতেশ, যাঁরা স্টেজে কম্পোজিসানের রাজা, মাস্টার, তারাও কিন্তু করেননি, যতটুকু দেখেছি। আমি বেশী দেখিনি। হয়ত অসিত এক্ষুণি দু'চারটে নাটকের নাম বলে দেবে। না দেখে বলছি, কিন্তু আমার ইম্প্রেশান হচ্ছে যে, লিফট করা হয়, একেবারে, অসিতের হেলেন অফ ট্রয়ের পর আমি ভয়ে আর কিছু দেখিনি, ঐ ইস্টম্যান কালার ইত্যাদি। কিন্তু একটা সারফেস চাই। যেখানে যার এগেন্সটে এই ভূমিকাগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠবে। থিয়েটার হচ্ছে তাই। সেখানে এনভায়রনমেন্ট এবং তার ভেতরের মানুষ সবটা মিলিয়ে মিশিয়ে তার আলোছায়া, আবহাওয়া, সঙ্গীত সবটা মিলিয়ে তৈরি হয় এবং তার চারপাশে ধাপ, সিঁড়ি, ঘর, আর্চ, গাছ, সাজেশন, সিম্বলিক, রিয়েলিস্টিক যা কিছু সবটা ঘিরে সবটা নিয়ে থিয়েটার। কিন্তু যাত্রা, লোকগুলোকে একেবারে খোলা হাওয়ার মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে। তার কোন পরিবেশ নেই, কোন সারফেস নেই। যেখানে তার ছায়া পড়বে বা যেখানে অন্ধকার হয়ে

গেলে হঠাৎ অন্ধকারটা মনে হল, দেয়াল থেকে আলোগুলো চলে যাবে, লোকের চোখগুলো জ্বল জ্বল করবে বা কোথাও আবছা আলো, কোথাও – ওখানে পাটাতন যেটা, যেটার ওপরে প্ল্যাটফর্ম হয়, সেটাতো লোকে দেখতে পায় না, বসে থাকে, এই লোকগুলো ঘোরাফেরা করে, পেছনে একটা ইয়নিং ডার্কনেস, তার এগেন্সটে চরিত্রগুলোকে ফোটানোর জন্য আলো বাড়ালেই হবে না, আলোর কারসাজি করলে, সেই আলো বা সেই আলোর ব্যবহার মুডকে সাহায্য করতে পারে, এক্সপ্রেশানকে দেখাতে সাহায্য পারে, কিন্তু up to a certain distance। একটা জায়গা পর্যন্ত। থিয়েটারের আধুনিকতম সংজ্ঞায়, ভালো থিয়েটার মানে সাতশো সিটের বেশি হওয়া উচিত নয়। লেটেস্ট - লাস্ট লাইন যেটা, সেটা ৭০ ফিটের বেশি গেলে চোখমুখ এক্সপ্রেশান হারিয়ে যায়। সে সবচেয়ে বড় অভিনেতা হলেও, সেই জন্যে থিয়েটারে, সিনেমার ক্লোজ-আপের বিকল্প যে স্পটলাইট, তার যে ম্যানিপুলেশান, একদিকে আলো, একদিকে কম, তার কন্ট্রাস্ট, এইগুলো করে, নানান রকম প্রক্রিয়াতে একটা মনোভাব, একটা সাইকোলজিক্যাল ডিসপোজিশান থেকে আর জায়গায় গ্লাইডকরা, সেটা থেকে আরেকটায় টেলিস্কোপ করা, লাইট কাজগুলো থিয়েটারে একরকমভাবে করতে শুরু করেছিল। জোনাল অ্যাক্টিং-ট্যাক্টিং যেগুলো বিদেশে এগিয়ে গেছে, আমরাও আমাদের থিয়েটারে এগুলো এসেছে এবং ব্যবহার হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকভাবে, শিল্পসম্মতভাবে। যাত্রায় সেই জিনিসটা করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় অসুবিধে যেটা আমরা দেখেছি যে, হওয়ার মধ্যে কিন্তু থিয়েটারে হওয়ার ফলে থিয়েটারে রিহার্সাল হয়, থিয়েটারতৈরি হয় এবং আজকে দেখবেন এই যে প্রত্যেক সিজনের আগে, স্টার, মহাজাতি সদন ইত্যাদি সব জায়গায় পোস্টার, সিনেমার চেয়ে ভালো। Attractive poster। সিনেমার চেয়ে বেশি বিজ্ঞাপন প্রবোধবাবুর পাতায় এবং সব বাবুর পাতায় পড়ে। কিন্তু থিয়েটারের জন্যে, থিয়েটারের রিলিজের স্টাইলে, বা সিনেমার, আগেকার দিনের সিনেমা যেরকম গ্র্যাঞ্জার দিয়ে রিলিজ হত, সেইরকম রিলিজের স্টাইলে, বিশাল বিশাল করে বিজ্ঞাপন, বিশাল বিশাল দিয়ে রেখেছে। থিয়েটারের লোকদের একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে। সে কারণে হয়ত, সাইকোলজিক্যালি আমার একটা আক্রোশ ছিল। যে কোন লোকের থাকতে পারে সেটা, সেখানে কমপ্লেন, জেলাসি, আত্মম্ভরিতা, অভিনয় সবটাই থাকতে পারে। কিন্তু যে জিনিসটা আমার কাছে শ্রদ্ধার এবং জানবার, যেটা প্রবোধবাবুও বলেছেন এবং এঁরা বলছেন, শমীক আমাদের বলেছে যে এতগুলো লোক, আমিও টাকার কারণেই গিয়েছি। সবচেয়ে প্রথম যদি বলা যায়, কোন বলতে লজ্জা নেই, অসিত সে কথাটাই বলেছে স্পষ্ট করে। নিশ্চয়ই টাকা রোজগার থিয়েটার থেকে হয় না। থিয়েটার থেকে যতটুকু হয়, তার থেকে বেশী যদি ভালো করে রোজগার হয় তাহলে নিশ্চয়ই যারা যে বৃত্তি করেন, সে বৃত্তিতে যদি আনন্দ হয়, উপার্জন হয়, সেটা সবচেয়ে অনারেবল, সবচেয়ে নোবল, তার মধ্যে কোন দোষের নেই। কিন্তু দূরে গ্রামে-গ্রামান্তরে যখন দেখেছি, দূর থেকে লন্ঠন হাতে হাজারে হাজারে লোক আসছে, জমা হচ্ছে, তারা দেখল, রাত্তির একটার সময় শেষ হল এবং আমরা যেখানে যেভাবে গাড়ীতে আরাম করে যাব তারা তার থেকেও কষ্ট করে যাবে। কেউ সাইকেলে, কেউ গরুর গাড়িতে, বাসে এবং বাস পাবে না, থেকেও যায় অনেকে। সেই লোকগুলো ভাল করে শুনতে পায় না, ভাল করে দেখতে পায় না। কিন্তু সেখানে এমন এমন কয়েকটা মুহূর্ত আসে, পুরো বইয়ের মধ্যে তিনটে কি চারটে পাঁচটা জায়গায়, তখন তারা আহা আহা করে ওঠে। তারা সেইটের জন্যে কিরকম করে যেন অপেক্ষা এবং কিরকম করে সেটা আগে থেকে প্রি-প্রিন্টেড হয়ে থাকে তাদের সাইকোলজিক্যাল মেক-আপে। ঐ এই জায়গায় সেই ওপর থেকে হঠাৎ আস্তে করে বলতে হবে। এইগুলো নিয়ে আমাদের থিয়েটারে আমরা যখন সবে শুরু করি, তখন আমাদের মধ্যেই শ্রদ্ধেয় অনেক অভিনেতা, অনেক পরিচালক, নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় বা অন্য অনেকের অভিনয় নিয়ে, বাংলার মহান ইয়ে নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ করেছেন, কিন্তু আমি দেখেছি, এই যে জিনিসটা এটা কেমন করে ভাল লাগে এবং এটা মনে একটা ভাল লাগা যেমন করে মানুষের মনে রং ভাল লাগে, যেমন করে মানুষের মনে একটা স্পেক্ট্যাকলের কতকগুলো আকর্ষণ আছে, তার ম্যাজিক আছে,

নাট্য শোধ সংস্থান

you cannot avoid it। একটা চাইল্ডিশনেস আছে এবং যেটা সবসময় টানে, ম্যাগনেটের মত, প্রচন্ড। সেই যে ব্যাপারটা, সেই যে ঝঙ্কারটা তোলে, এই রাত একটা-দেড়টার সময়, কষ্ট করে কত দুর-দুরান্তর থেকে আসে এবং একই পালা দেখে, কি আলাদা-আলাদা দেখে এবং তারা কি দেখে? সেখানে আজকে মফস্বলে পর্যন্ত সিনেমা, রেডিও, বিবিধ ভারতী সবকিছু ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জ্বলজ্যান্ত কতকগুলো ব্যাপার যার মধ্যে আমার মতে নিকৃষ্ট, সাব-স্ট্যান্ডার্ড বিষয়বস্তু, চিন্তা, ভাবনা, পেছিয়ে পড়া, প্রতিক্রিয়াশীল, অত্যন্ত কুসংকারাচ্ছন্ন কতকগুলো ব্যাপার আছে, এগুলো থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই হাহাকার করা কতকগুলো মুহূর্ত্ত থাকে, প্রচন্ড ঝংকার তোলে, প্রচন্ড ইয়ে হয় এবং এমন এমন নাটক, যেটা এমন এমন ইয়ে যেগুলো সর্বজনপরিচিত, থিয়েটারে ট্রায়েড, টেস্টেড, সেইগুলো অন্যভাবে, ঘুরিয়েফিরিয়ে এঁরা করেন। কিন্তু করলেও সেইটে – তার একটা অ্যাপিল আছে। 'নারায়ণ! নারায়ণ! ভাল কথা করায়েছ স্মরণ'– এইটে বললে যেটা হয়, এটা যদি prosaicভাবে কোন একটা কথা বল, সেটা লাগবে না কিন্তু শেখর গাঙ্গুলি যখন বলেন, তখনি একটা কিরকম আসে। এই রক্তের মধ্যে যে একটা চনমন করে ওঠে এইটে - কিন্তু যাত্রাও, ঐ যে আজকের দিনের থিয়েটার, সিনেমা, সাহিত্য সবকিছু নিয়ে, সেটাও কিরকম prosaic হয়ে গেছে। গান - যাত্রার মধ্যেও গান গাওয়ার লোক খুঁজে পান না এঁরা। ছেলে-মেয়ে কারুর মধ্যেই। তারাও বলেন, সত্যি এবং ঐ কনসার্টের পরেই প্রায় মিউজিক শেষ হয়ে যায়। প্রায় গানটান শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যে ম্যাজিক, যে দুর্নিবার আকর্ষণ আছে, তার জন্যে দূরে যেখানে রিচ করতে পারে না সেখানে – অনেকেই কলকাতায় আসেন, বর্দ্ধমানে যান বা অন্যান্য বড় টাউনে যান, ডিস্ট্রিক্ট টাউনে, কিন্তু সেইখানে গিয়ে হাজির হয় জ্বলজ্যান্ত করে এবং যখন ঐ ১০ হাজার, ১৫ হাজার লোক একসঙ্গে থাকে তার সাইকোলজি, ঐ যে পলিটিক্যাল লিডার বা মিনিস্টার বা মব সাইকোলজির কথা বলব বললেন, সেইখানে এর একটা একদম স্বতন্ত্র জায়গা আছে। যেইখানে দুটো-তিনটে লোকের টিপিক্যাল একটা মৃত্যুদৃশ্য বা একটা ট্র্যাজিক ইয়েতে, সেইখানে সমস্ত লোকগুলো জটলা বেঁধে একসঙ্গে কিন্তু তারা মুভড হয়, এবং তারা সমস্তটা একেবারে মুঠোর মধ্যে কন্ট্রোল করে নেয়। এই যে ফেনোমেনাটা এটা রেস্পেক্ট করার মত এবং এর থেকে লাইট, স্টেজ ক্র্যাফট, সিনারি এগুলো একদম বাতিল হয়ে গেলেও জাস্ট ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাদের কাছ পৌঁছোনোর জন্য যেমন চারটে আসরে এক সঙ্গে যেতে গেলে বাসে যেতে হয় তেমনি মাইক্রোফোন নিতে হবে, তেমনি আলো নিতে হবে। কিন্তু যেহেতু আমার থেকে আমার জুনিয়র যারা, তারা অনেক বেশী অভিজ্ঞ, যেমন অনিল সাহা, যেমন কণিষ্ক সেন, আরও অনেকে। আমিও গেছি। তারা তাপস সেন মানেই ঐ সেতু, অঙ্গার, ট্রেন, ভয়ঙ্কর কিছু আরে বাপরে বাপ। সে এক জ্বালা! প্রবোধবাবু তাতে আবার খুঁচিয়ে দেন। এইসব তারা কিন্তু এক্সপেক্ট করে। যেই না হল, যেই ভাবলাম যে বাঃ, কিরকম একটা কান্ডকারখানা, একটা শিল্যুয়েট হবে, এই দুটো-তিনটে চরিত্রের একটা ব্যাপার, আরে সেটা তো একদিক থেকে হবে, তিনদিক থেকে হতে পারে না। যেই একদিকে আলো আর পেছনদিক থেকে ছায়া হবে, এদিকে এই লোকটার হাফ লাইট হবে, এদিকে যারা দেখছে তারা তো ফুল লাইটে দেখছে। আমি স্টেজে দেখাতে পারি একটা লোকের দ্বিধাদ্বন্দ্ব to be or not to be করে। এই যদি করে এই লোকগুলো দেখবে, কিন্তু এ লোকতো পুরো আলোতে দেখবে, আর এ লোক দেখবে, দূর কি আলো করল, শালা দেখাই গেল না। থিয়েটারের থেকে যাত্রায় এই ডিফিকাল্টিটাকে কি করে সলভ করা যায়, আমি একেবারে সেখানে কিন্ডারগার্টেনে। আমি জানি না। I am trying my hands যে কিন্তু আমার এই রেসপেক্টটা আছে যেটা শমীক আমাকে বলেছিল, নেপাল নাগ আমাকে বলেছিল যে, এত লোকের কাছে যাচ্ছে, আমার ধারণা ছিল না। আমাকে এখনো দিল্লীতে, বম্বেতে লোকে সেতু, অঙ্গারের কথা বলে। কিন্তু যারা এখানে আছে এবং কত লোক কভার করছে যে স্ট্যাটিস্টিকসটা একেবারে স্টানিং প্র্যাকটিক্যালি। সেইখানে এই যে রেসপেক্ট এবং এই যে আকর্ষণ, এটা সম্পর্কে আমার ইয়ে আছে, কিন্তু এর আগে পর্যন্ত এটা আমি বলছি আমার নিজের ধারণা, এবং যে

ভাষায় ওদের সব নাটক লেখা হয়, যে ধরণের হয়, এবং থিয়েটারের ঐ যে একটা crippled compressed একটা atmosphere মধ্যে হয়, এবং ক্রমেই সেটা তার যেন একটা evil competition চলছে। কে কত বেশি বিজ্ঞাপন দিতে পারবে, কে কবে স্টারে ওপেন করতে পারবে, মহাজাতি সদনে ওপেন করতে পারবে, এবং সেটা অত্যন্ত unholy side of the ইয়ে। ওখানেও একটা স্টার সিস্টেমের কন্ট্র্যাডিকশান কাজ করছে। যে ফলস, inflated stardom এবং তার ফলে টাকাপয়সা দেওয়ার ব্যাপারে কতদিন কতলোক, কতটাকা, যেখানে কৃষিভিত্তিক লোকেরা এটাকে সাবস্ট্যানশিয়েট করছে, দিতে পারবে? পনেরো টাকা থেকে পাঁচটাকা টিকিট অ্যাভারেজ করে কতগুলো আসরে ক'টা দলকে ২৫ হাজার টাকা বায়না দিয়ে বা ১৫ হাজার টাকায় পোষাতে পারবে? এই কথাগুলো আসবে এবং সিনেমায়ও যেমন এই কন্ট্র্যাডিকশান আছে, থিয়েটারেও আছে। তেমনি ঐ কতকগুলো একেবারে ইক্যুয়ালিটির প্রশ্ন, মানবতার প্রশ্ন, যাত্রাতেও আছে এবং যাত্রাতে অনেকগুলো আচরণবিধি আছে যেগুলো বাইরের লোক এসে - হঠাৎ মনে হয় যে তাদের এই আছে, তাদের অনেকগুলো সুপারস্টিশান আছে। তাদের অনেক ধরণের ধর্মবিশ্বাস আছে, দিনক্ষণ দেখে পঞ্চাশবার করে ভাবে,। আরে, আগে কাজটা ভালো করে কর, তারপর দিনক্ষণ তো সব হয়ে যাবে। ঠিক করে কর না। তা আমি এখনো আমার বন্ধুবান্ধবদের বোঝাতে পারিনি।আর আমি তো সবে নতুন। আমার বেশী কথা বলা সাজে না। কিন্তু আমি এই যে হাজারে হাজারে লোকের বিনিদ্রভাবে অতদুর থেকে আসা যাওয়া এইটেকেই রেসপেক্ট করি। আর আমার অভিজ্ঞতায় সব জিনিসটাকে নতুন করে কি করে কাজে লাগানো যায় তার স্পেসের অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে, সবটা নিয়ে, অসিত বলল খানিকটা করেছে। অসিতের সঙ্গে আগেও কয়েকদিন কথা হয়েছে, আমরা বিদেশের থিয়েটারের ইতিহাসে জানি যে, রাশিয়ায় স্তানিস্লাভস্কির থিয়েটারের থেকে ভেঙ্গে কয়েকজন বিদ্রোহী বেরিয়েছিলেন। Meyerhold, Vaktangof, Tyrov, Okhlopkov এঁরা অনেক রকম চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং সেই অধ্যায়টা, সেই যুগটাকে যারা পড়াশুনা করেছেন আমার বন্ধুবান্ধবরা, উৎপলবাবুরা, অসিতবাবুরা, অজিতেশবাবুরা, তাঁরা সেই সম্পর্কে সচেতন থেকে কিছু করেননি। মহেন্দ্রবাবু, একসময় যিনি অনেক নতুন চিন্তাভাবনার দিশারী ছিলেন। অনেক আগে। উনিও আজকে যাত্রার সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাঁরা কেউই করেন নি। আমি এই সমস্তটায় পুরোপুরি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি। যে এই যে কমপ্লেক্স আমাদের, সেটা কিন্তু আমাদের নিজেদের অক্ষমতাও খানিকটা এবং যাত্রার একটা আর্টিফিসিয়াল, আনহেলদি কম্পিটিশান। মফস্বলে, বাইরের লোকেরাও কিন্তু আনন্দবাজার আর বিবিধভারতী শুনে বেশি ঠিক করে এবং সেইখানে যার যত মুরোদ আছে, আনন্দবাজারের বা যুগান্তরের বা অন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এত বড় করবে। হয়তো rightly or wrongly কিছুটা কল্কে পাবে। সেইটেও বোধহয় একটা unhealthy trend of jatra industry। সে ব্যাপারে প্রবোধবাবু অনেক গোড়া থেকে নাড়াচাড়া করছেন। উনি বলতে পারবেন। উনি অনেক জিনিসের জন্য দায়ী। উনি অনেক কিছু ভাল করেছেন, আবার অনেক কিছু হয়তো খারাপও করেছেন। করছেনও হয়তো।

অসিত বসু

এটার সম্বন্ধেআমি একটু বলি। আমি এটা লক্ষ্য করেছি, ওই ট্রেন্ডটা বোধহয় আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করছে। যাত্রার বায়নার দিক থেকে, বিজনেস পয়েন্ট থেকে যেটা বলছি, আগে যে বায়নাটা হোত, পয়লা বৈশাখ থেকে বায়না হতে শুরু করত, এখন রথের দিন major portion বায়না হয়। এখন আর তা হচ্ছে না। এই গত বছর থেকে স্পেশ্যালি ভীষণভাবে চোখে পড়ছে যে প্রোডাকশান না খোলা পর্যন্ত না দেখে বায়না হচ্ছে না। স্ট্যান্ডিং একটা ক্লায়েন্টেল থাকেই দলের। কিন্তু ইন জেনারেল সেভাবে – এক-একটা দলের গুড উইলে খানিকটা কাজ করে। কিন্তু জেনারাল ট্রেন্ডটা কিন্তু এইদিকে চলে যাচ্ছে। প্রোডাকশান না খুললে কিন্তু বায়নার খাতা খুব একটা খুলছে না। সব দলেরই বিশ-পঁচিশ-তিরিশটা ক্লায়েন্ট আছে, সে যাই করুক, নিয়ে যাবে। কিন্তু যেটার ওপর

দাঁড়িয়ে থাকবে সেটা কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে এই ভাদ্রমাসে বই –টই খোলার পর আস্তে আস্তে বায়নাটা শুরু হচ্ছে।

শ্রোতা

আমার একটু তাপসদাকে একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করি। সেটা হচ্ছে যে, আপনার সম্বন্ধে যে ধারণাটা আছে, ঐ অঙ্গার বলুন আর সেতু বলুন, যাত্রায় যখন এই ধারণাগুলো কাজ করে, আপনাকে যখন মালিকরা বা অন্যান্যরা যে প্রশ্ন করছে বা ডিমান্ড করছে, সে ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন?

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

সেটা হচ্ছে যে, তাপসবাবু গতবছরে 'কাগজের ফুলে' করেছেন, প্রথম আলো করেছেন। তার আগে অবশ্য নামটাম ছিল, কিন্তু ইন্টারেস্ট নিয়ে কাজ করেননি। গতবছর মোটামুটিভাবে তিন-চারটে কাজ করেছেন। এ বছরে আরো বেশী কাজ করছেন। কিন্তু গতবছর তো উনি ম্যাজিক করেন নি। জলও আনেন নি, মেঘও দেখান নি, কিছুই করেন নি। বহু দর্শক, যাত্রার দর্শক বলেছেন, দ্যাখো কি অসাধারণ কাজ করেছেন! ম্যাজিক করা ছাড়াও। সুতরাং, বহুজায়গায় বলেছে। যেমন ধরুণ, আমরা যে ছবিগুলো তুলেছিলাম ---তাপস যে লাইট করেছিল, তার মধ্যেই ছবিগুলো তোলা হয়েছে, সে ছবিতো বহুলোক দেখেছে। বহুলোক অবাক হয়ে গেছে কারণ তাপসবাবু--- এইরকম ছবি তারা হয়তো দ্যাখেইনি। কিংবা স্টেজ লাইটিং দেখেননি বা তাপসবাবুর স্টেজ লাইটিংও তারা দেখেননি চোখে। দেখে বলেছেন বাঃ, কি অসাধারণ! এটা কে করেছেন? না, তাপসবাবু। ও, আচ্ছা, কাজেই যে সবসময় ম্যাজিক করেই যে ভাল কাজ করা যায়, সেটাও নয়। তুমি যেটা বলতে চাইছ, বোধহয় সেই কথাটা কি?

শ্রোতা

না, আমি বলতে চাইছি তাপসদা, এই যে প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হচ্ছেন সেইগুলোর মোকাবিলা কি করে করছেন? সেইটাই জানার ছিল।

তাপস সেন

আচ্ছা। খুব ভালো কথা। এই থিয়েটারে, মানে কমার্শিয়াল থিয়েটারে গেলেও, স্বভাবতই কিছু কিছু প্রোডাকশানে কিছু কিছু environmental importance আসে, কোন নাটকে বেশী, কোন নাটকে কম। 'অঙ্গার' নাটকে আগাগোড়া এনভায়র্নমেন্টenvironment এবং যন্ত্রপাতি, আওয়াজ তার সবকিছু মিলিয়ে তার presentation। তেমনি 'কল্লোল', আবার 'নীচের মহল' বা 'চার অধ্যায়' নাটক করতে গিয়ে যেভাবে আমি ভেবেছি, যেভাবে শম্ভুবাবু ভেবেছেন, সবটা মিলিয়ে মিশিয়ে একটা হয়েছে। সেটাতে ঐ আলোর ফুলঝুরি কিছু না থাকলেও একরকমভাবে সেটা সকলের - কিন্তু ওই কোথায় কথা বলতে বলতে, সন্ধের অন্ধকার হয়ে যাবে এবং আলোর সুইচ টিপতে ভুল হয়ে যাবে। একেবারে রোমান্টিকএকটা ইয়েতে চলে যাবে সিচুয়েশনটা, হঠাৎ একটা মুহূর্তে আলোটা জ্বালাতে সবটা কেটে যায়, এটার দাম আছে। কিন্তু যখন কমার্শিয়াল থিয়েটারে আমাদের এমপ্লয় করা হয়, তখন একটা সিন-এর চাহিদা থাকে। তারজন্যে বলাই হয়। কখনো সেটা ফিট করে, কখনো ফিট করে না। যেমন, 'মল্লিকা' নাটকে ছিল, গল্পের মধ্যে ছিল, ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, আমি অমনি ট্যাক্সিটা ধরে ফেললাম। ওইটুকুই ছিল। আর কিছুই ছিল না। 'অঘটনে' মোটর সাইকেলে একটা লোক – একটা চরিত্র ছিল, সে মোটর সাইকেলে করে আসত। জ্ঞানেশ যে চরিত্রটা করত। সেইটে থেকে ঠিক হল, ওটা কাজ করে এবং সাবিত্রী চ্যাটার্জ্জী প্লাস মোটর সাইকেল দেখতেও লোক গেছে। 'সেতু'তে তৃপ্তি মিত্র, সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে---নরেশ মিত্র ছিলেন, অসিতবরণ --- স্ট্রং কাস্ট। কিন্তু 'সেতু' নাটকের সময় আমি বললাম যে দূর মশাই, আমার পানশে লাগছে --- কি রকম জোলো। তা আমাকে দক্ষিণেশ্বর বাবু বললেন, কি রকম আপনি চান? আমি বললাম একটা আন-ইউসুয়াল কোন সেটিং-এযদি কোন নাটক হয়, হাওড়া ব্রিজের তলায় বা একটা ফ্যাক্টরী বা একটা ধরুণ,

এয়ারপোর্ট বা লেভেল ক্রসিং, তার এগেন্সটে হলে – তো কি আছে? ওই লোকটাকে ইয়ে করে দিন না, পয়েন্টসম্যান। শান্তি গুপ্তাকে তার বউ করে দিন, তাহলে ঐ হবে, 'যাসনি খোকা' বলে ধরবে। বললুম, সে কি মশায়? আমি তো ট্রেনের সিনও করতে লাগলাম আর এদিকে গল্প নিয়েও ভাবতে লাগলাম। করে করে আমি সিন-টা যখন প্রায় আধাআধি হয়েছে, অনেক টাকাপয়সার শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে, জলাঞ্জলি, এখন মাখনলাল নট্টর যেমন টাকা খসিয়ে দিচ্ছে, বিশ্বরূপা থিয়েটারে অনেক – পাঁচটা নেট-ফেট তৈরি হয়ে গেল, তখনও হয় না। কিন্তু যখন হব হব, তখন একদিন মনে হল, আমি বললাম যে, দূর! কিরণ মৈত্রের থেকে বিধায়ক ভটচাজ নাটক করলেন। বিধায়কবাবুকে বললাম যে এ যদি নায়ক বা নায়িকা বা সেন্ট্রাল কোনো ক্যারেকটার আসে, না আসে, ঐ নাটকের সাব-সাব-সাব প্লটের একজন, তার পয়েন্টসম্যানের বৌ এসে বলবে,খেতে পাচ্ছি না, দারিদ্র্য মানে কিরণ মৈত্রের গল্প ছিল 'বুদবুদ', না খেতে পেয়ে মারা যাবে, তাকে অ্যাডপ্ট করবে বলে, নেবে যেদিন সেদিন এসে শুনবে সেই বাচ্ছাটি মারা গেছে। বুদবুদের মত সবটা ফটাস্। এই গল্পকে অ্যাম্পলিফাই করে কিরণ মৈত্র যেটা লিখল, হয়নি। তারপরে বিধায়কবাবু লিখলেন। যেহেতু আগের বই 'ক্ষুধা' হিট করেছিল, তখন টেন্টেটিভলি নামও দেওয়া হয়েছিল 'তৃষ্ণা'। আমি বললুম, তৃষ্ণা কিরকম মশাই? সন্তানের জন্য তৃষ্ণা, কিরকম রাক্ষুসী- রাক্ষুসী লাগবে না? তা যাই হোক, তারপরে আমি বললাম যে, এটা তাহলে নায়ক-নায়িকা কিরকম করে হচ্ছে? আমি রাত্তিরে ভেবেচিন্তে একটা খাড়া করে দক্ষিণেশ্বর সরকারকে বললাম যে, মশাই, সুইসাইড করবে, এরকম গান হবে, ইয়েটিয়ে হবে, একটা আলগা আলগা – দূর! ওই মশাই রেলের তলায় মেছুনী-ঘেঁটুনীরা সুইসাইড করে। এইসব বলবেন না, মিসেস মিত্র তাহলে থিয়েটারের কন্ট্রাকটই ছেড়ে দেবে। আর বিধায়কবাবু তো রাজিই হবে না। আমি তখন চলে গেলাম নিউ আলিপুরে ড. রাধাবিনোদ পালের বাড়িতে। 'রক্তকরবী' অভিনয় হচ্ছিল। সেখানে গিয়ে আমি ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে বললাম। আগে শম্ভুবাবুকে বললাম, এরকম করলে কিরকম হয়? বললেন, হ্যাঁ, এটা বলেছ, ---তারপরে মিসেস মিত্র বললেন, তারপরে বললেন----তারপরে আমি দক্ষিণেশ্বরবাবুকে বললাম না—মিসেস মিত্রর সঙ্গে কথা তো হয়ে গেছে, কি করে হবে? বিধায়কবাবু কি বলেন? বললেন, এটার তো সীনই নেই, এটা তো নেই--- গেলাম তাঁর কাছে, বাড়িতে। দাদা, এরকম এরকম --- তা শুনে, পরের দিন ভোরবেলা, সাড়ে ছ'টার সময় গেলাম। উনি খানিকটা খসড়া লিখলেন সেটাকে খানিকটা এধার ওধার করে নায়িকা ট্রেনে আত্মহত্যা করতে ঝাঁপ দিল। অসিতবরণ নায়ক তাকে রক্ষা করল – এই। নাটকের মিশে গেল বা মিশে গেল না ইন্টারভ্যালে। তখন আবার কথা হল গোড়াতে এটা দেখানো হবে না, শেষকালে? আমি বললাম একবারে শেষে। উনি বললেন না। এটা নিয়ে নানারকম গবেষণা হয়েছিল। এখন, যাত্রা বা যে কোন কমার্শিয়াল অ্যাসাইনমেন্টে তারা তো এক্সপেক্ট করে যে খদ্দের টানবে কিসে এবং কোনটা বেশ রগরগে– একেবারে জমকালো। তাদের ঐটে যদি অ্যাট্র্যাকশান থাকে, সেটাকে দোষ দিতে যেমন পারি না, তেমনি 'কাগজের ফুলে' কিছু করিনি, আর 'রাত্রির তপস্যা'ও হয়ত কিছু করব না। তাতে মাখনবাবুরও হয়ত ভালো লাগবে না। আর বর্তমান নাটক 'গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম', মাইথোলজিক্যাল ব্যাপার। উৎপলবাবুর 'ছায়ানটে'র ডায়ালগ, অজিত --- তা এইটেতে বেশ আছে কিছু স্পেক্ট্যাকল বা কালার ফুল। সেইটেকেরেছি এবং কিছুটা নিশ্চয়ই কমার্শিয়াল অ্যাট্র্যাকশান থাকে বা চায়, সব জায়গায় দেওয়া যায় না। কারণ 'চিরকুমার সভা' করতে গিয়ে তাতে তো লাইটের খেলা হবে না। তা যেমন ধরুন, এখানেও করতে পারব না। তা সে নাটক অনুযায়ী, এখানে একটা সিন-ও যদি অ্যাকোমডেট করা যায়, আমারও তো নিজের অস্তিত্বের সংকট, আমাকেও তো নিজেকে জাস্টিফাই করতে হবে ! আমি একটু লাগাবার চেষ্টা করলুম, 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এ যা করেছিলাম সেইটেকে রিপিট করে দিলাম। আবার কণিষ্ক সেনও 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'–সেও একটা কি যেন করেছে। তা সে তো করেছে, তা আমি অনেক ভেবেচিন্তে করেছি। কণিষ্ক আরেকরকম ভাবে ভেবে করেছে। আমি দেখিনি। হয়েছে একটা কিছু। এ করতে হয়।

<u>প্রতিভা অগ্রবাল</u>

শমীক, তুমি কিছু বল ---

<u>শ্রোতা</u>

প্রবোধবাবু, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি।যাত্রাজগতের স্টারের সবচেয়ে বেশী মাইনে কত? নামটা চাইনা, শুধু কত অ্যামাউন্ট সেটা চাই।

<u>প্রবোধবন্ধু অধিকারী</u>

সবচেয়ে হাইয়েস্ট যিনি মাইনে পেতেন, তিনি এখন আর যাত্রা করছেন না। বাহাত্তর হাজার টাকা পার মান্থ। প্রতিবছর একটা করে নতুন গাড়ি, দুপ্যাকেট ইন্ডিয়া কিংস সিগারেট।

<u>অসিত বসু</u>

যেদিন সই করলেন সেদিন থেকে নতুন গাড়ি। দুপ্যাকেট করে ইন্ডিয়া কিংস সিগারেট, কাজুবাদাম, কিসমিস-

<u>প্রবোধবন্ধু অধিকারী</u>

কি পরিমাণ কাজুবাদাম, তার সঙ্গে কতটা কিসমিস, কতটা লবঙ্গ --

<u>অসিত বসু</u>

তার মুরগি এবং তার কুকুর সঙ্গে যাবে তার জন্যে মুরগি --

<u>প্রবোধবন্ধু অধিকারী</u>

তিনি যখন ভাত খাবেন তিনি গ্যারান্টি দিতেন যে আমি থাকলে আপনাকে ২ লাখ টাকা প্রফিট দোব।

<u>অসিত বসু</u>

তিনি গ্যারান্টি না দিলে তাকে এসব দেবে কেন?

<u>শ্রোতা</u>

তিনি দিয়েছেন?

<u>অসিত বসু</u>

নিশ্চয়ই দিয়েছেন। এসব কি সবাই চাইলে পাবে?

<u>তাপস সেন</u>

আচ্ছা, প্রতিভাজি, আমায় এখন এই স্টান্ট সিনটা এখন দেখাতে হবে স্টার থিয়েটারে। সিনের সময় এগিয়ে এসেছে। এবারে না গেলে আর তো চাকরি থাকবে না।

<u>প্রতিভা অগ্রবাল</u>

ক'টার সময় আছে?

<u>তাপস সেন</u>

ওই তো সিন এসে গেছে। চোদ্দ নং সিন হচ্ছে এখন, সেটাতে একটা দৃশ্যাকর্ষণ আছে। তারপর আর তিনটে সিন। সুতরাং, আমি চলে যাই।

<u>প্রতিভা অগ্রবাল</u>

অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

পালাগানের পালাকার

Brajen Dey
Sombhu Baag
Shailesh Guhaniyogi
Bhairab Gangopadhyay
Utpal Dutt

পালাগানের শিল্পী

পালাগানের শিল্পী

Shantigopal
Dwiju Bhawal
Khokan Biswas
Phanibhushan Bidyabinod

পালাগানের যাত্রাপথে

Durga Das Dipen Chatterjee & Khokan Biswas in Nati Binodini Natta Company

Swapan Kumar and Swapna Kumari in Michael

Dilip Chaterjee & Jyotsna Dutta in Sonai Dighi / Satyambar Opera

পালাগানের যাত্রা পথে

Mukul Ghosh &
Bina Dasgupta
in Bandhya Janani
Bharati Opera

Bina Dasgupta in Jamuna Aajo Kande

Manoj Kumar in Swadhinatar
Phanki / Bharati Opera

পালাগানের যাত্রা পথে

Manoj Kumar & Chhabi Chaterjee in
Kajir Bichar / Bharati Opera

Mohan Chatterjee & Mita Chatterjee
in Meghnad Badh/ Mohan Opera

Gurudas Dhada & Jyotsna Dutt
Pagli Daktar / Gitanjali Opera

Sujit Pathak in
Shubhada /
Bharati Opera

পালাগানের পুরুষ ‘রানি’

টীকা

i (১৯৩২ - ১৯২৭)। সাংবাদিক, যাত্রাশিল্পের পুনরুজ্জীবনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।
ii (১৯২৪ - ১৯২৬) খ্যাতনামা আলোকশিল্পী
iii (১৯৪৩ -) নাটককার, অভিনেতা, নির্দেশক। দীর্ঘকাল যাত্রায় যুক্ত ছিলেন।
iv (১৯৩০-) হিন্দি নাট্য জগতের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। অনুবাদক, নাটককার, অভিনেত্রী, নাট্য শোধ সংস্থানের অধিকর্তা।
v (১৯৩৩ - ১৯৮৩) নির্দেশক অভিনেতা নাটককার
vi (১৯৪০ -) প্রাবন্ধিক, সমালোচক এবং নাট্য গবেষক
vii (১৯২৯ - ১৯৯৩), নাটককার, নির্দেশক এবং অভিনেতা
viii (১৯৩৩ - ২০১৪) নির্দেশক, অভিনেতা। দীর্ঘকাল যাত্রার সঙ্গে যুক্তা ছিলেন।
ix (১৯৩৬ - ১৯৯৩) নির্দেশক, অভিনেতা।
x (১৯৪৪ - ২০০২) যাত্রার প্রখ্যাত অভিনেতা
xi ব্রজেন্দ্রনাথ দে রচিত যাত্রপালা (১৯৫৮-৫৯)
xii কলাকাতার বিখ্যাত কয়েকটি যাত্রাদলের নাম
xiii আলোকশিল্পী (১৯৩৮ -)
xiv যাত্রাশিল্পী গুরুদাস ধাড়া (১৯৩৬-১৯৯৭)
xv উৎপল দত্ত রচিত যাত্রাপালা (১৯৬৮)। প্রযোজনা নিউ আর্য অপেরা
xvi (১৯১৪-১৯৭২) আধুনিক যাত্রার প্রবক্তা
xvii (১৯০৭-১৯৬১) যাত্রাশিল্পী ফনিভূষণ মতিলাল
xviii (১৯১০-১৯৮৪) পেশাদরী রঙ্গমঞ্চের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। নাটককার ও নির্দেশক
xix (১৯৩৪-২০১২) বিখ্যাত যাত্রা অভিনেতা
xx রচনা পরিচালনা উৎপল দত্ত (১৯৬৯), সত্যম্বর অপেরা
xxi (১৯২৬-২০০৮) মঞ্চ ও চলচিত্রের অভিনেতা ও পরিচালক

নাট্য শোধ সংস্থান